ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র

ড. প্রেমেন আড্ডি

ইন্দিরা গান্ধী :
ভারতের রাজনৈতিক আকাশে
একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র

মূল ঃ ড. প্রেমেন আড্ডি
অনুবাদ ঃ সঞ্চিতা

জ্যোৎস্না পাবলিশার্স
ঢাকা

www.pathagar.com

ইন্দিরা গান্ধী : ভারতের রাজনৈতিক আকাশে
একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র
ড. প্রেমেন আড্ডি
অনুবাদ ঃ সঞ্চিতা

প্রকাশক
জ্যোৎস্না পাবলিশার্স
১২/১৩, প্যারী দাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১৭১-২৫৩৭৫৫১, ৭১১-০৮৪৩
E-mail jyotsna_publishers@yahoo.com.
প্রথম বাংলা সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি–২০১০
স্বত্ব
লেখক
বর্ণবিন্যাস
আদ্রিতা কম্পিউটার
ঢাকা–১২০৩
প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন
মুদ্রণে
আল্-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০
মূল্য
একশত টাকা মাত্র
ISBN NO. 984 70148 0015 5

INDIRA GANDHI : INDIA'S WOMAN OF DESTINY
By : Dr. Premen Addy
Translated by : Sanchita.
Published by : Jyotsna Publishers, 12/13, Pyari Das Road,
Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Telephone : 0171-2537551; 711-0843
First Bengali Edition : September, 2008
Second Esition : February-2010
Price : Tk. One hundred only. £ 3.00; $ 6.00.

www.pathagar.com

লন্ডন,
১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

মি. স্বপন কুমার দত্ত
জ্যোৎস্না পাবলিশার্স,
১২/১৩, প্যারী দাস রোড,
বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রিয় স্বপন বাবু,

এই পত্রের মাধ্যমে ইংরেজী ভাষায় রচিত আমার "Indira Gandhi : India's Woman of Destiny" বইটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশের জন্য আপনাকে অনুমতি দিলাম।

আমি আপনার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। ইতি—

প্রেমেন আড্ডি
(Dr. Premen Addy)
29/D, Formosa Street,
London, W9 2JS

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	অনুবাদকের কথা	...৭
	পূর্ব কথন	... ৮
	ভূমিকা	... ৯
প্রথম অধ্যায় ঃ	নেতৃত্বের পটভূমি	... ১৩
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	প্রধানমন্ত্রী ঃ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম	... ২৩
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	বিজয় এবং অবক্ষয় ...	... ৩৫
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	জরুরী অবস্থা এবং পতন ...	... ৫৩
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ...	... ৬৪
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	ইন্দিরা গান্ধীর অবদান এবং ইতিহাসে তার আসন...	... ৮৬
	টীকা ও ব্যাখ্যা ...	... ৯২
	সহায়ক পত্র-পত্রিকা ...	... ৯৪
	গ্রন্থপঞ্জী	... ৯৫
	নামপঞ্জী	... ৯৬
	আলোকচিত্র	... ৯৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

আমাদের প্রজন্মের প্রধানতম গর্ব আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেছি। সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতার-পক্ষশক্তি বলে বিবেচিত হবার যোগ্যতা যারা রাখেন, তারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, দেশের বাইরে কারও কাছে যদি স্বাধীনতার জন্য ঋণ স্বীকার করতে হয়, তা' হলে সর্বাগ্রে যে নামটি আসবে তা' হলো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব-জনমত গড়ে তোলার জন্য সে সময় তিনি কী না করেছেন। আক্ষরিক অর্থে দ্বার থেকে দ্বারে ফিরেছেন। সর্বরকমভাবে সহযোগী থেকেছেন বাংলাদেশের। কিন্তু ক'জনই-বা আমরা মনে রেখেছি—আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তাদান কালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ৩,৬৩০জন নিহত, ৯,৮৫৬জন আহত এবং ২৩০জন নিখোঁজ হয়।* এক কোটিরও বেশি শরণার্থী তখন ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতের প্রতিটি সহানুভূতিশীল মানুষের কাছে আমরা ঋণবদ্ধ।

ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে আমার ছিল অসীম কৌতূহল। তাঁর সব কিছুতেই, তাঁর চলাফেরা, তাঁর চমৎকার হাসি, তাঁর সুশ্রী আনন, সব কিছু অনন্য ছিল আমার কাছে। তাই যখন প্রেমেন আড্ডি'র এই চমৎকার বইটি অনুবাদ করার সুযোগ এলো, সেটি লুফে নিতে সময় নষ্ট করিনি।

এ দুঃসাহস আমার কেমন করে হলো? এর উত্তর–জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। আমি কাজটি শেষ করার পর তিনি দেখে দেবেন, তাঁর এই সম্মতি আমাকে সাহস যুগিয়েছিল। তাঁর কাছে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রথম ঋণ যার কাছে তিনি যুক্তরাজ্যবাসী লেখক ও সাংবাদিক আবদুল মতিন। তিনিই উদ্যোগী হয়ে বইটি অনুবাদ করার অপূর্ব সুযোগ আমাকে দিয়েছেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

সঞ্চিতা
মার্চ, ২০০৮

* "Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh." by Salam Azad, published by Onkur, p.14

www.pathagar.com

পূর্ব কথন

এটি একটি অনুসন্ধিৎসু রচনার বেশী কিছু নয়। পূর্ণাঙ্গ জীবনীকে যদি তেলরঙে আঁকা ছবির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা' হলে এই রচনাটিকে জলরঙে আঁকা ছবি বলা যেতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী'র মৃত্যুর কয়েক মাসের ভেতরেই লন্ডনে বসে এটি লেখা হয় এবং দু'একটি সামান্য অদল-বদল ছাড়া মূল লেখাটি একই রয়েছে।

যদিও এর ব্যাপ্তি খুব বেশী নয়, তবু এ কাজটির প্রেক্ষিতে আমি অনেকের কাছে ঋণী। পিটার পেন্ডসে লেখাটি পড়েন। মানেক বাজিফদার এটির মূল বৈশিষ্টের প্রেক্ষিতে আলোকপাত করেন। ডঃ সুরজিৎ সেন, কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং স্কুল থেকেও যিনি আমার পুরনো বন্ধু, নিঃশর্ত সময় দিয়েছেন আমায়। তার বিভিন্ন মন্তব্য এবং পর্যবেক্ষণ লেখাটির যথার্থতা বৃদ্ধির কাজে দারুন সহায়ক হয়েছে।

আমার গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণ টি. এন. কাউলের কাছে। মস্কো এবং ওয়াশিংটনে নিয়োজিত ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে তিনি ছিলেন বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী। একই সঙ্গে ইতিহাস তৈরিতে তিনিও তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্যারিসে ইউনেস্কো বোর্ডে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে প্রবল কাজের চাপ সত্ত্বেও মিঃ কাউল গুরুত্বের সাথে পাণ্ডুলিপিটি পড়েছেন, তথ্যগত কিছু ভুল শুধরে দিয়েছেন এবং ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর সহযোগিতা এবং উৎসাহ দান সর্বাংশে অমূল্য। সবশেষে রাজিব নিয়োগীকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, যিনি প্রেসের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করেছেন। আমি আর একটি কথা যুক্ত করতে চাই। বইটি'র যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, তার জন্যে কেবল আমি দায়ী।

প্রেমেন আড্ডি
লন্ডন
সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। কিছু তাঁর জীবদ্দশায়, কিছু তাঁর নিহত হবার পর। ড: আড্ডির বইটিতে দু'টি সময়কেই ধারন করবার সুবিধাটা আছে। কোথাও তার কোন পক্ষপাত নেই। সত্তরের দশকে বহির্বিশ্বের হুমকীর মুখে ভারতের নিরাপত্তা এবং অখন্ডতার প্রেক্ষিতে দেশকে নিরাপদ রাখা এবং অধিকতর শক্তিশালী অবস্থানে দেশকে নিয়ে যাবার কৌশল গ্রহণের বিষয়ে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকাকে প্রশংসা করতে গিয়ে আশির দশকের শুরুতে দেশের অভ্যন্তরে আসাম এবং পাঞ্জাবের অবস্থার অবনতির বিষয়টিও তিনি বলতে ভোলেননি। তিনি যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর অসাধারন অর্জনের কথা বলেন, দেশের জরুরী অবস্থায় তাঁর বাড়াবাড়িকেও তখন তিনি ক্ষমা করেন না; ক্ষমা করেন না জনতা সরকারের আড়াই বছরের দুঃশাসনের মারাত্মক সব ভুলগুলোকে।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম জীবন, তাঁর অসাধারন পিতার অধীনে তাঁর শিক্ষানবীশি এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস তিনি তাঁর মা'য়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছিলেন, যা তার ব্যক্তিগত অসাধারণ সব গুণাবলী—তাঁর অচিন্তনীয় বিপুল সাহস, দুর্দিনে নির্ভয় এবং বিজয়ে নম্র থাকা, স্থির সঙ্কল্প এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি, সবশেষে কিন্তু গুরুত্বে সর্বোচ্চে, ভারতের সৌভাগ্যে তাঁর আস্থা এবং বিশাল জনগোষ্ঠির সাথে তাঁর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে প্রচ্ছদপট হিসেবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁর দৃঢ় অসাম্প্রদায়িক বিশ্বাস, গণতন্ত্রের প্রতি তার দায়িত্ব এবং গণতন্ত্রে ফিরে আসা (জরুরী অবস্থায় যদিও তার বিচ্যুতি ঘটেছে, যার জন্যে অংশত জনতা পার্টি এবং বিরোধীদের নৈরাজ্যমূলক হুমকী দায়ী) ইত্যাদি বিষয়গুলো সহজ কিন্তু শক্তিমান ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ড: আড্ডি'র লেখনী বাহুল্যবর্জিত কিন্তু জোরালো, সহজে বোঝা যায় এবং একই সাথে আকর্ষণীয়। তাঁর পরিবেশিত তথ্যগুলো পরীক্ষিত এবং সত্যকে দৃঢ় ভাবে সমর্থন করে, কিন্তু অতিরিক্ত উপাত্ত এবং পাদটীকা দিয়ে বইটিকে ভারাক্রান্ত করা হয়নি। তাঁর চেতনা সুশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল। অনেকের মত কাল্পনিক তোষামোদ দ্বারা তিনি চালিত হননি অথবা বিরক্তিকর কোলাহলে পরিণত করেননি। তিনি একজন ইতিহাস রচয়িতার মত

www.pathagar.com

লিখেছেন—ঐতিহ্যবাহী এবং সাম্প্রতিক, সদ্য উত্থিত শক্তিগুলি এবং গভীর ভাবে প্রোথিত ধর্মীয় এবং অন্যান্য বিষয়গুলোর বিপরীতে বাস্তব ভিত্তিতে। বইটি লিখতে তিনি এমন ভাবে ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের গতিধারার বর্ণনা করেছেন, যা বিষয়টিকে একই সাথে আকর্ষণীয় এবং চিন্তার উদ্রেক করেছে। আমি মনে করি, লেখক যে সব সমস্যাগুলোর উল্লেখ করেছেন তার গভীরে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে প্রবেশ করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি ভারতবর্ষকে নিয়ে একটি বই লিখবেন, ইতিমধ্যেই তিব্বতকে নিয়ে যেমনটি লিখেছেন—গভীরভাবে বিশ্লেষণধর্মী এবং একই সাথে সৃষ্টিশীল, দর্শনের সাথে ইতিহাসের মিশেল, রাজনীতির সাথে অর্থনীতির। কাজটিতে তিনি আধুনিক বিশ্বের জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রবাহ এবং বিপরীত প্রবাহের বিস্তীর্ণ কাঠামো এবং সময়কে ধারণ করেছেন।

অন্য কেউ ডঃ আড্ডির সাথে একমত হতেও পারেন, না-ও পারেন। সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এক এক ধরনের মানুষের এক এক ধরনের অভিমত থাকতে পারে। একটি বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে আলাদা আলাদা ভাবেও দেখা যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি, সেটি হচ্ছে ঘটনাগুলোকে বিশ্বস্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং বাস্তবসম্মত ভাবে উপলব্ধি করা। ডঃ আড্ডি বর্তমান পরিবেশে যতটা সম্ভব তা করতে চেষ্টা করেছেন। এটা সম্ভবতঃ ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়ানের পর ভারতীয় ইতিহাসে তার আসন নির্ধারণের পক্ষে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচয়িতারা সন্দেহ নেই যে তা করতে সক্ষম হবে। যা হোক, এটা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে ভারতের ইতিহাসে ইন্দিরা গান্ধী, স্বাধীনতার সময় থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অধিকার করে আছেন তার নিজস্ব শক্তিতে, জওহর লাল নেহেরুর মেয়ে বলে নয়।

সেখানে এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি তার পিতার চেয়েও সাহসী ছিলেন। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে ১৯৭১-এ বাংলাদেশে যুক্তিযুদ্ধ সঙ্কট এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিষয়টিকে। সেখানে এমন মুহূর্তও ছিল যে কংগ্রেস ১৯৬৯-এ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—তিনি তখনও তাঁর পিতার চেয়েও ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়েছেন। আবার এ দৃষ্টান্তও আছে যেখানে তিনি দল এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত বিপদ আশঙ্কার বোধ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেমনটি জরুরী অবস্থায় তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আচার-আচরন—যেটা জওহর লাল নেহেরু কখনো করতেন না।

www.pathagar.com

এ রকম ভাবে রায় দেয়া খুব সহজ, কিন্তু এটাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে স্বাধীনতার সুফল তাঁর পিতা যে ভাবে উপভোগ করেছেন, ইন্দিরা গান্ধী তেমনটি পারেননি। তাঁর না ছিল বিশ্বস্ত সঙ্গী থাকার সুবিধা না দক্ষ সহকর্মী, তাঁর পিতার যা ছিল। নেহেরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেসী নেতাদের মান লক্ষণীয় ভাবে হ্রাস পায়। একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী তাদের সবার ওপরে ছিলেন যাকে তাঁর এমন কী পুরুষ স্বদেশী ভক্তরাও এই বলে সম্ভাষণ করতেন যে, "মন্ত্রীসভার এক মাত্র ব্যক্তি।"

মোটামুটিভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে সবাই স্মরন করবে একজন লাজুক, সহজ, কোমল নারী হিসেবে, যার ছিল লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তি, যার ছিল ইস্পাতকঠিন স্নায়ূ, অনমনীয়, বিশেষ করে সঙ্কটের দিনে। যদিও স্বাভাবিক সময়ে অনেকখানি উদাসীন। তিনি ছিলেন অসাধারন এক নারী। অনন্যসাধারন প্রতিভাময়ী একজন রাজনৈতিক নেতা। তার মোহময়তা এমন ছিল যে রাজনৈতিক বিরোধীরাও তাঁকে 'দূর্গা' এবং 'শক্তি' নামে প্রীতিসম্ভাষণ করতেন। হিন্দু মন্দিরে এই দুই দেবী সাহস এবং শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। ইন্দিরা গান্ধী এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি শক্ত এবং সুবেদী। নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেননি কেবল পরিবারের কাছাকাছির সদস্যদের কাছে ছাড়া, নিজের চেতনাকে রেখেছেন একান্তে, অবারিত। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, যা তিনি প্রকাশ করবার পূর্ব পর্যন্তও লুকিয়ে রাখতেন বুকের পাঁজরে।

এই 'ভূমিকা' লিখতে গিয়ে আমাকে অভিমত দেবার প্রলোভনকে জয় করতে হয়েছে। সেটা করলে তা খুব আগে ভাগে করা হত। আমি দেখেছি ডঃ আড্ডি'র বইটি খুবই উদ্দীপক এবং আকর্ষণীয়। আমি নিশ্চিত সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে ছাত্র এবং পণ্ডিত, কূটনীতিক এবং রাজনীতিবিদ, সবাই উপকৃত হবেন একটি জটিল ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ পড়বার সুযোগ পেয়ে, যে ব্যক্তিত্বটি ঘরে-বাইরে প্রবল চাপের মুখেও ভারতের অখন্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ যে কারো চেয়ে বেশী অবদান রেখেছেন।

জুন, ১৯৮৬

টি.এন. কাউল
প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব,
ভারত সরকার

www.pathagar.com

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২)।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

নেতৃত্বের পটভূমি

যেদিন ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দু'জন শিখ দেহরক্ষীর হাতে নিহত হলেন, সে-দিনটি ছিল অক্টোবর ৩১, ১৯৮৪ সন। সেদিন একটি যুগের অবসান হল। "দি ইকোনমিস্ট" পত্রিকা তাঁকে "নৃপতি, দেবী-মূর্তি, সাহসের-রানী" বলে উল্লেখ করেছে। তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে ১৮ বছর ধরে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশের প্রতিটি কোণে কোণে, ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর, ধর্মমতের এবং রাজনৈতিক মতের মানুষেরা তাঁকে হারানোর গভীর বোধ থেকে কষ্ট পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই নৃশংস হত্যার ফলে দেড় দশক ধরে যে দেশটাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সে দেশের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সব চুক্তিগুলো স্তব্ধ হয়ে গেল। সাহস এবং সংকল্প ছিল সে চুক্তির ভিত। এবং সেগুলো কখনো ভারতের একতা এবং অখন্ডতা বিপন্ন হবার অনুভূতির চেয়ে বড় কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি।

সে বছর জুন মাসে অমৃতসরে স্বর্ণ মন্দিরে গুলিবর্ষনের ঝুঁকির বিষয়ে তাঁর তুলনায় কনামাত্র কেউ বেশী সচেতন ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মেজাজের সাথে তা তিনি এমনভাবে মিশিয়ে রেখেছিলেন যে তাঁর মর্মান্তিক গুলিবিদ্ধতার মাত্র ২৪ ঘন্টা আগে তিনি উড়িষ্যার এক সমাবেশে তাঁর সুরেলা গলায় উচ্চস্বরে বলেছিলেন, "দেশের জন্যে যদি আমাকে মরতেও হয়, আমি তাতে গর্বিত হব। আমি নিশ্চিত, আমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু জাতির উন্নয়নে সহায়তা করবে, তাকে বলবান এবং শক্তিশালী করে তুলবে।"—শব্দগুলো তাঁর শৈশবের আদর্শ জোন অব আর্ক-কে মনে করিয়ে দেয়।

তাঁর শেষ ক'টা বছরে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের একটা অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও ইন্দিরা গান্ধীকে মনে রাখতে হবে ভারতীয় সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের অসাধারন ক্ষমতার জন্যে। তাঁর সমসাময়িক আর কেউ তা পারেননি। মৃত্যু তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু তার জীবনের বাণীকে স্তব্ধ করতে পারেনি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের একতা এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, এবং করলেনও; সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করলেন তিনি। ব্যাপারটা এই ছিল যে দু'জন শিখ প্রহরী বহাল

www.pathagar.com

রাখার বিষয়ে তাঁর নিরাপত্তা উপদেষ্টামন্ডলী তাঁকে সতর্ক করে দেবার প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুযায়ী তিনি বিপরীত দিকে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন, যারা অবিচল ভাবে তাঁকে হত্যা করল।

সময়টা ছিল শোকের আর পেছনে ফিরে তাকাবার। দিনের পর দিন তাঁর রাজনৈতিক লড়াইটা পড়ে থাকল প্রেসের এক পাশে আর দিস্তা দিস্তা কাগজ ছেপে বার হল তার কর্মজীবনের গুরুত্ব নিয়ে। নিশ্চয়ই সেখানে ত্রুটি ছিল। কিন্তু সর্বজনীন বিচারে তাঁর অসাধারণ অর্জনের কাছে সে সব খড়কুটোর মত ভেসে গেল। যে আদলটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল সেটি একটি শক্তিমান এবং অনন্য সাধারণ ব্যক্তি-মানুষের। একজন চমৎকার রাজনৈতিক কৌশলী, যিনি একই সাথে একজন তীব্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ, উচ্ছল এবং পরিবারের রক্ষাকর্ত্রী, তাঁর বন্ধুত্বের সীমানা বিভিন্ন মহাদেশব্যাপী, হৃদয়বৃত্তিতে তীব্র সংবেদনশীল। এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। বিশ্বস্তভাবে।

ইন্দিরা গান্ধীর জীবনকাহিনী শুরু হয় এলাহাবাদে, নভেম্বর ১৯, ১৯১৭ সালে। জওহরলাল এবং কমলা নেহেরুর একমাত্র সন্তান। তিনি একটি সফল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যে পরিবারটি রুচি এবং উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রসিদ্ধ।

নেহেরুরা ছিলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মন। তাঁদের ভেতরের অন্য অনেকের মত তাঁরাও মোগল সাম্রাজ্যের পড়ন্ত দিনগুলোতে নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে দক্ষিণ মুখো হন; আরো সবুজ আরও স্থায়ী চারণভূমির খোঁজে। “দি প্যাক্স ব্রিটেনিকা” ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে কর্মে নিযুক্তি দেবার নতুন উপায় এবং আইন ও প্রশাসনে সুযোগ করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল। কাজটি তারা করে উদ্যমী ও সাহসীদের জন্যে। সময়ের সাথে এগুবার জন্যে যা যথেষ্ট।

মতিলাল নেহেরু ইন্দিরার জন্মের সময় ছিলেন পরিবারের কর্তা। তিনি তখন প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞ। ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে তাঁর পেশার জগতে। তাঁর লাভজনক পেশায় তিনি অনেক সম্পদের অধিকারী হন। যার ভেতর থেকে ‘আনন্দ’ এবং ‘স্বরাজ ভবন’ আজও জীবন্তস্মৃতি হয়ে টিকে আছে। তাঁর জীবনাচরনে অযোধ্যার পুরনো মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য গ্রহণ করতেও তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। এই সব নবাব এবং মহারাজারা শতাব্দীর পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্তর্ধান করে “রাজ”-এর নকল প্রতিরূপে পরিণত হন। যার সবটাই ছিল একটা ফাঁকা আড়ম্বর, প্রধানতঃ আত্মপ্রসাদে পূর্ণ।

www.pathagar.com

উর্দু এবং ফার্সী-তে মতিলালের জ্ঞান এবং দখল থেকে তাঁর সুগভীর সাংস্কৃতিক শিকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। যথাসময়ে তার সাথে যুক্ত হয় ইংরেজী। বৃটেনের কেন্দ্রীয় বিধানসভার একজন সদস্য তাঁর বর্ননায় তাকে এ ভাবে উন্মোচন করেন : "তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ এবং একজন দক্ষ আইনজীবী। একই সাথে একজন চমৎকার, সংস্কৃতমনা এবং পরমতসহিষ্ণু মানুষ। তিনি সভ্যতার উচ্চতম ধারায় সমৃদ্ধ গুণাবলীর ধারক। সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন একজন 'গ্র্যান্ড সেনিয়্যার' (Grand Seigneur) —তাদের মত, যারা ইতিহাসের স্বর্ণযুগে আবির্ভূত হন। আমি তাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করি তার উচ্চমার্গের ভদ্রতাবোধ এবং তারুণ্যের প্রতি প্রাণবন্ত সমর্থনের জন্যে। অবাক হবার কিছু নেই যে তাঁর পরিবার তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ গৃহকর্তা......তাঁর বাড়ি ছিল অবারিত। যারা জীবনের ভাল বিষয়গুলো উপভোগ করে, যারা তাকে একজন মহান আইনজ্ঞ এবং জাতীয় নেতা হিসেবে মানে, তাদের সবার জন্য তাঁর বাড়ি ছিল "তীর্থস্থান".......আমাকে যা সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য করেছিল.......তাঁর রাজনৈতিক শত্রুদের প্রতি তাঁর সহিষ্ণুতা। কোন কুঁদুলেপনা, উত্তেজনা বা তিক্ততা মামলায় প্রদত্ত তাঁর যুক্তিকে খর্ব করতে পারত না; তা হোক সে আইন সম্বন্ধীয় অথবা রাজনৈতিক.......মতিলাল সব কিছু করেছেন উদার ভাবে। তাঁর ভেতরে কোন অসম্পূর্ণতা ছিল না।

টিউডার ইংল্যান্ডের নবতম আভিজাত্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী নেহেরুরা প্রাথমিক ভাবে ভূঁইফোড় বলে গণ্য হতে পারেন কিন্তু সাধনা, শিক্ষা এবং বিস্তৃত সাংস্কৃতিক অর্জনের কারণে সত্যকার অর্থে তাঁরা অভিজাত হয়ে ওঠেন। জওহরলাল নেহেরুর অভিজাত চালচলন এবং তার কন্যা ইন্দিরার খাঁটি আত্মশক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং পরিবারের যৌথ অর্জন থেকে প্রবাহিত হয়েছে, যেহেতু তাঁরা সম্ভ্রান্ত পরিবেশ এবং মর্যাদার ভেতর বাস করেছেন। তাঁরা জনসাধারণের অংশ হতে পারেন, তবু তাঁদের অবস্থান সাধারণের বাইরে।

ইন্দিরা গান্ধীর শৈশব, কৈশোর এবং তারুণ্য কেটেছে স্বাধীনতা-পূর্ব টালমাটাল দশকগুলোতে। উদার নিয়মতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল ধারা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ফুলেফেঁপে উঠছিল। গান্ধী এবং তাঁর মুখ্য পরামর্শক গোখলে এক সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে একেবারে তৃনমূল থেকে আদর্শবাদীদের বের করে আনতে হবে। মহাত্মা অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। এই ডাক নেহেরুদের ওপর তড়িৎ প্রভাব ফেলল। মতিলাল, জওহরলাল, কমলা এবং অন্য সবাই বৃটিশ-দের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই-এ ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের

www.pathagar.com

অনেকে মাঝে মাঝেই গ্রেফতার এবং আটক হতেন। তার অর্থ হচ্ছে ইন্দিরা নিরাপদ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হলেন, তাঁর মত একটি মেয়ে যা স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যাশা করার অধিকারী ছিল।

তিনি প্রবাসী ছিলেন, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছিলেন। জাতীয় প্রয়োজনে তিনিও কিছু করেছিলেন তাঁর মত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে "বাঁদর" বাহিনী গঠন করে। তারা কংগ্রেস-এর জন্য গোপন সংবাদ সরবরাহ এবং বার্তা প্রেরণ করত। সে সময় অধিকাংশ শীর্ষ নেতারা কারাগারে ছিলেন।

মতিলাল নেহেরু ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারীতে মারা গেলেন। তাঁর পুত্রবধু পাঁচ বছর পর তাঁকে অনুসরণ করলেন প্রচণ্ড রুগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে। ইন্দিরা বিশেষভাবে তাঁর মা'য়ের সান্নিধ্যে ছিলেন। যিনি ছিলেন পাশ্চাত্য প্রভাবিত একটি গৃহের ঐতিহ্যবাহী প্রথা এবং আচারে অভ্যস্থ একজন নারী। মা'য়ের কাছ থেকে তিনি পান হিন্দু ঈশ্বর ভক্তির উত্তরাধিকার। একই সাথে তাঁর বাবার অজ্ঞেয়বাদ এবং যুক্তিবাদী চিন্তা চেতনার সাথে সংশ্লিষ্টতা তাঁকে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধে দীক্ষিত করে, যার ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানমনস্কতা। ধর্ম ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়; কিন্তু তাঁর বাবার মূল্যবোধের প্রতি তার আনুগত্য কোন অংশে কম বিশ্বস্ত ছিল না। আগাগোড়া তা পালিত হয়েছিল এই দৃঢ় বিশ্বাসে যে ভারতীয় সমাজের নানা মতবাদ সব চেয়ে প্রাণবন্ত হতে পারে অসাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থার ভেতরে। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং তার প্রযুক্তিই ভারতকে মধ্যযুগীয় ধ্যাণ ধারণা থেকে বের করে আধুনিক সময়ে পৌঁছে দিতে পারে।

এলাহাবাদে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ নিরীক্ষাধর্মী প্রতিষ্ঠানে। প্রকৃত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির নান্দনিকতার ওপর জোর দিয়েছেন। এখানে ইন্দিরা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভার প্রসন্ন দৃষ্টির সান্নিধ্যে লেখাপড়া করেন। প্রথাগত ভাবে নয়। এবং উপলব্ধি করেন রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভার বহুমুখীনতা, কবি, চিত্র শিল্পী, সুরকার এবং দার্শনিক হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল কর্মের মাধ্যমে উনিশ শতকে বাংলা রেনেঁসার প্রকাশ ঘটে। তার সাথে থাকে জটিল অনুসন্ধানের শক্তি, সংস্কৃতির নবায়ন, সামাজিক পুণর্বিন্যাস এবং রাজনৈতিক প্রাগ্রসরতা। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মিসেস গান্ধী শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসবে 'শিক্ষার সাম্রাজ্য' শীর্ষক ভাষণে তাঁর ব্যক্তিগত এবং গোটা ভারতবাসীর পক্ষ থেকে বাংলার কাছে ঋণ

www.pathagar.com

স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "ধর্ম বিষয়ে এবং সামাজিক পুণর্বিন্যাসে, সংস্কৃতির রেঁনেসা এবং রাজনৈতিক বিবর্তনে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান সন্ততিরা আমাদের ক্রমবিকাশকে মূর্ত করেছেন। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সাথে আমিও এই সব মহান এবং পন্ডিত ব্যক্তিদের সুবেদী, প্রতিভাদীপ্ত এবং বৈপ্লবিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি।"

যদি শান্তিনিকেতন ইন্দিরার জীবনে একটি মাইলফলক হয়, অন্যটি হচ্ছে 'বেক্স'-এর সুইস স্কুল। সেখানে তিনি সুচারুরূপে ফরাসী ভাষা শিখেছেন এবং ফরাসী সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ বিস্তার লাভ করেছে। অনেক বছর পরে ফ্রান্সের জাতীয় সংসদে তিনি ফ্রান্সের নাগরিকদের উদ্দেশে সাবলীল ফরাসী ভাষায় ভাষণ দিয়েছেন।

'বেক্স' থেকে তিনি অক্সফোর্ডে সমারভিল কলেজে যান। কিন্তু ডিগ্রী না নিয়েই ফিরে আসেন। প্রধান কারণ তাঁর ক্রমান্বয় স্বাস্থ্যহীনতা। কিন্তু এই বিরতির ফলে ঐ পর্য্যায়ে তাঁর জীবনে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ সম্ভবত অন্য কিছু ছিল।

ব্রিটেন থাকাকালীন তিনি হ্যারল্ড ল্যাসকি, ফেন্যার ব্রকওয়ে এবং শ্রমিক আন্দোলনের আরও সব সাহসী মানুষের সাথে দেখা করেন। তাতে করে আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর আগ্রহ বেড়ে যায়। ইন্দিরার কাছে বৃটেন ছিল বাইরের বিশ্ব দেখবার অন্যতম খোলা-জানালা, যেমনটি ছিল তাঁর বাবার, তৎকালীন জাতীয়তাবাদীদের এবং পূর্ব-প্রজন্মের মানুষের কাছে। তাঁদের মত তিনিও বৃটিশ সরকারকে অপছন্দ করতেন, কিন্তু ব্যক্তি মানুষ হিসেবে বৃটিশ নর-নারী ছিল আন্তরিক এবং প্রাণবন্ত।

তাঁর চারপাশের বিশ্ব একটি তরুণ অনুসন্ধিৎসু মনের জন্য যথেষ্ট উপাদান সরবরাহ করছিল। ভারতের পরিস্থিতির বাইরে, ইউরোপ এবং এশিয়ার পূর্বাংশেও ভিন্নভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠছিল। জার্মানিতে হিটলারের জয়, ইটালীর মুসোলিনী এবং জাপানের সাথে তাদের মিত্রতা আবেসিনিয়া, স্পেন, অষ্ট্রিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় ফ্যাসীবাদী আগ্রাসনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই যুদ্ধটা যতটা আদর্শিক ছিল ততটাই ছিল রাজনৈতিক এবং সামরিক। এর ফল ছিল ১৯১৭'র রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব এবং সেই সাথে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের বিষয়ে মার্কসীয় দর্শন, যা সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে এবং সামজিক পদমর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করতে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

যখন সমগ্র বিশ্বের কমিউনিস্টরা তাদের নিজস্ব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায়

www.pathagar.com

নির্দেশ এবং অনুপ্রেরণার জন্য মস্কোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তখন বৃটিশ 'ফেবিআন'-দের (British Fabians) মত সমাজতন্ত্রীরা বেশী করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির কারণে। সেখানে তারা দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ ফলনহার সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন এবং জনগণকে বিপুলভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। ১৯৩০'র শুরুতে যে ধ্বস নেমেছিল, তার পেছনে ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মহীনতা, অন্ততঃপক্ষে জার্মানিতে হিটলারের ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্ট পার্টির উত্থান সহজ হয়েছিল সে কারণে। তারা সোভিয়েত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপাদানগুলি লক্ষ্য করেছিলেন যাকে ওয়েবস (Sidney & Beatrice Webb) বলেছেন 'একটি নতুন সভ্যতা'। বস্তুতঃ তৎকালীন বামপন্থী প্রজন্মের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাপট যথেষ্ট সতর্ক হয়ে উঠেছিল। সে বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে ম্যালরাউস (Malraux)-এর প্রমিত ভাষায়, "আশার দিনগুলো।"

এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় মেয়েকে লেখা জওহরলাল নেহেরুর চিঠিগুলোতে ('গ্লিমসেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' নামে প্রকাশিত হয়েছে)। সেখানে প্রাচীন যুগ থেকে সমসাময়িক সময় পর্যন্ত মানবজাতির গল্প স্বচ্ছ ভাষায় এবং সহজ বাগ্মীতায় বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিহাসবিদ ভিক্টর কিয়েরন্যান উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, "আমাদের শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসভিত্তিক রচনা।" জীবন এবং চিঠিগুলো মিলে মিশে নেশাভরা বুদ্ধিগত পানীয়ের আবহ তৈরি করেছে। তা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি এবং সভ্যতার ভেতর অভিন্ন সম্পর্কের সূত্র সন্ধান করেছে। বিভিন্ন জাতির ভেতর থেকে ভারতের আসনের ওপর আলো ফেলেছে তা। স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে সাংস্কৃতিক অথবা রাজনৈতিক স্বতন্ত্রীকরণের নিষ্ফলতা।

এই প্রশিক্ষার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতেই হয়। এর ফলে ইন্দিরার পক্ষে একই সাথে বিশ্বায়নের পটভূমিতে এবং জাতীয়ভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতাকে হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে তাঁর পঞ্চাশ বছরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পুপুল জয়কার বলেছেন, "তাঁর শিকড় ছিল ভারতে। ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ, সাথে হৃদয়টা ছিল আধুনিক, যা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরের বিশ্বটাকে দেখতে পেত।"

১৯৪০-এ ইন্দিরা ঘরে ফিরে আসেন। পরবর্তী ক'টা বছর ছিল নানা ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। কংগ্রেসে তীব্র সঙ্কট। বাংলার তৎকালীণ সব চেয়ে বড় নেতা সুভাষ বোস মহাত্মা গান্ধীর জন্যে তাঁর লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়ে দল থেকে পদত্যাগ করে নিজের দল ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেছেন। পরে

www.pathagar.com

গোপনে তিনি দেশ ত্যাগ করেন এবং অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি জাপানের সহযোগিতায় বৃটিশ-দের কাছ থেকে ভারতকে মুক্ত করবার পরিকল্পনা করেন। অবশেষে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সমবায়ে তৈরী তাঁর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি জাপানী সেনাবাহিনীর সাথে পাশাপাশি যুদ্ধ করে।

মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে তাদের বিখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেখানেই আভাস পাওয়া যায় সাত বছর পরের ভারত বিভাগের করুন পরিণতি।

১৯৪২ সনে ইন্দিরা পার্সী আইনজীবি ফিরোজ গান্ধীকে বিয়ে করেন। যাকে তিনি এবং তাঁর পরিবার দীর্ঘ দিন ধরে জানতেন। দু'জনেই তাঁরা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অচিরেই গ্রেফতার হলেন। ছাড়া পেলেন এক বছর পর। তাদের দুই ছেলে রাজিব আর সঞ্জয়। অনেক বছর পরে নিজের পারিবারিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে ইন্দিরা রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দেন, "প্রতিটি শিশু এই বার্তা নিয়ে আসে যে বিধাতা মানুষকে নিরুৎসাহিত করেন না।" এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য ছিল, "কিন্তু একজন নারীর কাছে মাতৃত্ব হল সর্বোচ্চ পূর্ণতা। এই পৃথিবীতে নতুন একটি প্রাণ নিয়ে আসা, তার ছোট ছোট অর্জন এবং তার চমৎকার ভবিষ্যতের স্বপ্ন যে কোন অভিজ্ঞতার চেয়ে বেশী স্পর্শী এবং যে কাউকে বিস্ময়ে এবং আনন্দে পূর্ণ করে দেয়।"

"যেহেতু রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণে আমার নিজের শৈশবটা অস্বাভাবিক ছিল, একাকিত্ব আর নিরাপত্তাহীনতায় ভরা, আমি তাই ঠিক করেছিলাম যে আমার সবটুকু সময় আমি বাচ্চাদের দেব।" স্বামী-স্ত্রী দূরে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলেরা পরবর্তী বছরগুলোতে তাঁর ভরসা হয়েই ছিল।

এর মধ্যে যুদ্ধের শেষের দিকে বাংলায় মন্বন্তর। একটা অন্ধকার সময়। ৩০ লক্ষ মানুষ মারা পড়ে সে সময়ে। এই যুদ্ধের অবসান ভারতের জন্যে সামান্যই আশা অথবা আলো বহন করতে পেরেছিল। দেশে তখনও রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিক্ষোভ বিরাজ করছিল। বাংলায় চাষীদের তে-ভাগা আন্দোলন খুব দ্রুত সংগঠিত হচ্ছিল। বোম্বাই-এ নৌ বিদ্রোহ প্রমাণ করেছিল যে 'রাজ'-এর প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার অঙ্গীকারও বিদ্রোহের আগুনে আক্রান্ত হতে পারে।

এ রকম একটা বিস্ফোরক উন্মুখ পটভূমিতে নেতাজী'র ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির বন্দী সৈনিকদের বিচারের উদ্যোগ ছিল সম্ভবত: ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌছানো। সামরিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে আই.এন.এ.

www.pathagar.com

ছিল শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। কিন্তু তা সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পেরেছিল। সুতরাং সে অবস্থায় বিচারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা একটি ভাল পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল ভারত ভাগের অস্পষ্ট অশরীরি ছায়া।

১৯৪২ সালে যুদ্ধে অংশ নেবার বিনিময়ে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেবার ব্যাপারে 'ক্রিপস মিশন'-এর প্রতিশ্রুতি অস্পষ্ট থাকায় তারা কংগ্রেস-এর সহযোগিতা পেতে ব্যর্থ হন। ১৯৪৬ সালে একই ভাবে 'ক্যাবিনেট মিশন'ও ব্যর্থ হল ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন পেতে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে একমত হতে পারেনি যাদের কাছে বৃটিশরা ভবিষ্যতে ভারত সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে। সেই মুহূর্তে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের ভেতরে বিরোধ ছিল উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্যে একটি আলাদা আবাসভূমির দাবি সম্পর্কিত বিষয়ে, যা ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছিল।

'ইসলাম বিপন্ন'—মুসলিম লীগের এই স্লোগান পাঞ্জাবে ঝড়ো নির্বাচনী বিজয় এনে দিল। 'ক্যাবিনেট মিশান'-এর প্রস্থানের সাথে সাথে ঘোষণা করা হলো 'ডাইরেক্ট এ্যাকশান ডে'-র। দিনটি ছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট। তার ফল হলো ভয়ঙ্কর। কলকাতায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলমান নিহত হয়। সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লো পূর্ব বাংলার নোয়াখালী এবং বিহারে।

লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন বৃটেন-এর শেষ ভাইসরয় হিসেবে ক্লিমেন্ট এ্যাটলী'র লেবার সরকারের স্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে ভারতে এলেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছেড়ে চলে যাবে। ভারত এগিয়ে যাবে নতুন 'ভাগ্যের সাথে মিলিত হবার নির্দিষ্ট দিনে', যেমনটি জওহরলাল নেহেরু স্থির করেছেন আগস্ট ১৫, ১৯৪৭। এই দিনে ঔপনিবেশিক দাসত্বের পায়ের বেড়ি চূড়ান্ত ভাবে ছুড়ে ফেলে ভারত। সে কারণে আনন্দ ছিল অসীম, একইভাবে বেদনারও পারাপার ছিল না।

ভারতীয় জাতীয়বাদীরা যে স্বাধীনতার জন্যে লড়ছিলেন; তাতে ফাটল ধরেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশটা দু'টুকরো হয়ে গেল; ভারত আর পাকিস্তান। এই বিচ্ছেদের সঙ্গী ছিল ভয়াবহ-সাম্প্রদায়িক ধ্বংসযজ্ঞ এবং পাঞ্জাব ও বাংলায় জনসংখ্যা ভিত্তিক আন্দোলন। তার ফলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাতে ইন্দো-পাকিস্তান সম্পর্ক অসম্ভব রকম বিকৃত হয়ে পড়ে।

মুক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহর লাল নেহেরু। মহাত্মা গান্ধী আগেই কংগ্রেস থেকে তাঁর সম্পর্কে সব সন্দেহ দূর করেছিলেন তাঁর

www.pathagar.com

মোহন বাগ্মীতায় এই কথা বলে যে : "নির্ভিকতায় তাঁকে (নেহেরু) ছাপিয়ে যাওয়া যায় না। সন্দেহাতীত ভাবে তিনি চরমপন্থী, তাঁর পারিপার্শ্বিকতা ছাড়িয়ে তাঁর চিন্তা অনেক দূরগামী। কিন্তু তিনি যথেষ্ট নম্র এবং তাঁর বাস্তবতা বোধ এ রকম যে কখনো সীমা ছাড়িয়ে যান না। তিনি ক্রিস্টালের মত স্বচ্ছ, তাঁর সততা সন্দেহের অতীত। তাঁর হাতে জাতি শঙ্কামুক্ত।"

মাউন্টব্যাটেনও নেহেরুর পক্ষে ছিলেন। যাকে সর্বসম্মতভাবে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল পদে বরণ করা হয়। তাঁর এই পদায়ন ছিল ইন্দো-বৃটিশ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে একটা প্রতীকী বিষয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অর্জন করা যাচ্ছে, কমনওয়েলথ-এ ভারতীয় সদস্য পদ নিশ্চিত করা।

ইন্দিরা গান্ধী নেহেরুর গৃহ-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিলেন। পরে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "প্রথমে এটা ছিল নতুন দিল্লীতে আমার বাবার জন্যে কেবল ঘরদোর গুছিয়ে দেয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে থাকবার বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত হবার বিষয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আমার ব্যক্তিগত উৎসাহে দেশ কোন পথে চলতে চেষ্টা করছে, সে বিষয়টিতে আমার গভীর আকর্ষণ জন্মাল।"

তিনি তাঁর বাবার সঙ্গী এবং আস্থার স্থল হয়ে উঠলেন। তিনি প্রথমেই জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অবস্থান দৃঢ় করার দিকে দৃষ্টি দিলেন। মূখ্যতঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল-এর প্রতিভাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়; বিশাল রাজ্যের নানা রকম কাজকর্মে একটি যোগ্য উত্তরাধিকারকে সফলতার সাথে তিনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করেছিলেন। হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর হতে পারে একমাত্র ব্যতিক্রম, বাকি অন্য সব স্থানে তখন শান্তি লক্ষ্যনীয়ভাবে বিরাজ করেছে।

দেশের বাইরে তখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোরিয়া, ইন্দো-চায়না, সুয়েজ, হাঙ্গেরী, চীনের জাতিসংঘে আসন গ্রহণ এবং পারমানবিক যুদ্ধাস্ত্রের মত সঙ্কটজনক অবস্থার ফলে নেহেরুর জোট-নিরপেক্ষ নীতি ক্রমে ক্রমে আদল পাচ্ছিল। বিশ্ব-সমাজে ভারতের অবস্থান সংহত হচ্ছিল তাতে। এর ভেতরের শক্তি ছিল, সবার সাথে সহযোগিতা, কারু কাছেই নতি স্বীকার নয়।

অভ্যন্তরীণ ভাবে ভারতের কেন্দ্রীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের, যা নিয়ন্ত্রিত হয় অসাম্প্রদায়িক নীতিমালার দ্বারা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর অনেকখানি মর্যাদা ছুড়ে ফেলে দিলেন দেশে গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে। অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে তিনি ছিলেন পরিকল্পিত শিল্পায়নের একজন দৃঢ় সমর্থক। সোভিয়েত-দৃষ্টান্তের প্রতি অনুরাগ এবং নিজস্ব ধীর ও

www.pathagar.com

ক্রমান্বয়িক সমাজতন্ত্রের পক্ষপাত তাঁকে এ পথে পরিচালিত করে। কিন্তু সেই সাথে বাস্তব বিবেচনাবোধও জড়িত ছিল। ভারতের বেসরকারী ব্যবসায়ী পরিমন্ডলে সে সময় বৃহৎ আকারের শিল্প উদ্যোগের জন্য মূলধন, বিশেষজ্ঞ এবং উদ্যোক্তার অভাব ছিল। নেহেরু তা অনুধাবন করে জাতির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে আইনগত ব্যবস্থা নিলেন। ইস্পাত, বিদ্যুৎশক্তি, রেলপথ এবং জ্বালানী সরকার অধিগ্রহণ করল। বিষয়টি এখনও পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতিতে সব চেয়ে কার্যকর চালিকাশক্তি।

এই পর্যায়ে উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। এর মধ্য থেকে কয়েকটিকে কেবল বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয় যাতে পরবর্তী সরকারগুলো বেশী করে লাভবান হতে পারে। আমেরিকার 'নিউজ উইক' ম্যাগাজিনের ভাষ্য এ রকম, "ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী"র উদ্দেশ্য একদল সেরা গ্রাজুয়েট তৈরী করা, যেখানে প্রবেশাধিকারের মান এবং পাঠক্রম 'ম্যাচাচুয়েটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী' এবং 'ফ্রান্সেস ইকোল পলিটেকনিক'-এর সাথে তুলনীয়।

স্বাধীন ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর আনুষ্ঠানিক অভিষেক ঘটে ১৯৫৫-তে শাসকগোষ্ঠির সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী পরিষদ 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি'-তে সদস্যপদ প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। চার বছর পর তিনি কংগ্রেস-এর প্রেসিডেন্ট হন।

এটা ছিল তার রাজনৈতিক শিক্ষানবীশী পর্যায়ের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। ক্ষমতার রাজপথে একটি প্রধান পদক্ষেপ। একই সাথে আদর্শিক এবং মানবকল্যান বিষয়ে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ এবং সমৃদ্ধি অর্জন সম্বন্ধে তিনি বলেন, "আমার মা আমাকে শিখিয়েছেন মাটিতে কীভাবে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হয়, আর বাবা আমার নভযানকে নক্ষত্রের পথে ধাবমান হবার জন্যে অনুপ্রাণিত করতে কখনো ক্লান্ত হননি।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রধানমন্ত্রী : কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

জওহর লাল নেহেরু ২৭ মে, ১৯৬৪ তারিখে মারা যান। একজন মহান জাতীয় নেতা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গণে রাষ্ট্র পরিচালনায় একজন দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর বিজয় ইন্দিরা গান্ধী যেমন উপভোগ করেছেন তেমন তীব্র কষ্ট পেয়েছেন তাঁর খারাপ সময়ের বছরগুলোতে। ১৯৬২'র অক্টোবরে চীন-ভারত সীমান্ত-যুদ্ধে তিনি বাবাকে দেখেছেন একজন ভাঙ্গাচোরা মানুষ। ঘরে বাইরে তাঁর নৈতিক কর্তৃত্ব তখন দুর্বল হয়ে গেছে।

ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধী মারা যান ১৯৬০-এ। বিধ্বস্ত ইন্দিরা তখন সরকারী জীবন থেকে অবসর নেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন হিমালয়ের মত একজন সহায়কে হারাবার পর তাঁর পরিবারকে সাহচর্য্য এবং সান্ত্বনা দেবার জন্যে। তিনি চেয়েছিলেন এর পর নারী এবং শিশুদের কল্যাণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন। তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীরা বিষয়টা আবার ভেবে দেখতে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নেহেরুর মৃত্যু তার সাথে যুক্ত করল নেতৃত্বের স্বাভাবিক সঙ্কট এবং তাঁর নাম।

সুতরাং লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যখন তাঁকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব দিলেন, ইন্দিরা গান্ধী খানিক দ্বিধা এবং অনিচ্ছা নিয়েও তা গ্রহণ করলেন।

উচ্চ পর্যায়ে এটাই সম্ভবতঃ ছিল তাঁর মনোরম অভিজ্ঞতা। চলচ্চিত্র সমালোচক অমিতা মালিক ১৯৬৫'র জানুয়ারী মাসে ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত তৃতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর ঔজ্জ্বল্য, মর্যাদা এবং দক্ষতার কথা স্মরণ করেন। তার আগে পর্যন্ত সে আয়োজন কখনো এত নান্দনিক ছিল না। একটি সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী হিসেবে তিনি একদল গৃহপালিত সংস্কৃতি-সেবীদের আনীত অভিযোগও খণ্ডন করেন। তাদের অভিযোগ ছিল যে শ্রেষ্ঠ বিদেশী চলচ্চিত্র হিসেবে উপস্থাপিত ছবিটি দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে বিপথগামী করে দিতে পারে।

চলচ্চিত্র অনুরাগী মিসেস গান্ধী বিষয়টিতে যথাযথ পূর্ণতা আনেন তাঁর

www.pathagar.com

বাড়িতে একটি অন্তরঙ্গ ভোজসভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে। সেখানে ওয়াজদা, টরী নিলসন, গিওর্জেস স্যাদাউল, বিবি এন্ডারসন এবং সত্যজিৎ রায়ের মত গুণী ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। ভোজের চমৎকারিত্বও সেদিনের আয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

পরে তিনি আলজেরিয়ার চলচ্চিত্র 'দি ব্যাটেল ফর আলজিয়ার্স' দেখে মুগ্ধ হন। স্বচ্ছন্দ ফরাসী ভাষায় তাঁর চিন্তা এবং প্রতিক্রিয়া বিনিময় করেন। এমন কী যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী, এ রকম অবসর যখন তার জীবনে দুর্লভ হয়ে পড়েছে, তখনও ইন্দিরা গান্ধী চলচ্চিত্র ভুবনের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। কুরোছাওয়া'র সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন; আসামের দুলাল সাইকিয়া'র মত অপেক্ষাকৃত কম বিখ্যাত মানুষদের সহযোগিতা করেছেন, ফ্রান্সে সম্মান অর্জনের জন্যে অভিনেত্রী স্মিতা পাতিলকে অভিনন্দন জনিয়েছেন, অথবা স্যার রিচার্ড এ্যাটনবরা'র ছবি 'গান্ধী'-কে সরকারী অর্থ সাহায্য প্রদান করেছেন, যা ছাড়া তাঁর ছবি হয়ত কখনো সম্পূর্ণ হত না।

টান টান কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এটা ছিল অপেক্ষাকৃত ভাবনাহীন মধ্যবর্তী কাল। কিন্তু সমুখের কর্মভার গ্রহণের স্পষ্ট আভাস ছিল তাতে। অচিরেই তাঁর আসল তেজদ্দীপ্ত ছটা প্রকাশ হতে শুরু করল। উদাহরণ টানা যায় মাদ্রাজের ঘটনা দিয়ে। সেখানে হিন্দীর বদলে ইংরেজী চালু'র সিদ্ধান্তের ফলে প্রচন্ড উত্তেজনা এবং সহিংসতার সৃষ্টি হয়। জনরোষ কতদূর বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেটা বোঝা যায় উত্তর ভারতের দমন প্রক্রিয়ায়। মিসেস গান্ধী সমস্যার কেন্দ্রস্থলে গেলেন এবং তামিলদের ক্রোধ শান্ত করলেন। সাধারণ মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনের তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা সহজেই স্পষ্ট হল। সেটা ছিল তাঁর অনন্য প্রতিভার প্রথম নিদর্শন।

দেশের প্রতি দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত বড় বিপর্যয়টা এসেছিল বাইরের দিক থেকে। নেহেরুর মৃত্যু এবং চীনের সাথে দ্রুত সমাপ্ত সীমান্ত-সংকটে ভারতের আসন উপমহাদেশের অন্যান্য শক্তি এবং বর্হিবিশ্বের কাছেও অবনমিত হয়েছিল।

পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো এই মত প্রকাশ করলেন যে নেহেরুর প্রস্থানের অর্থ হল ভারতে অনিবার্য্য পালা বদলের দিন শুরু হচ্ছে। তিনি পরে লিখেছেন, ভারত হল একটি 'দুর্বল, বাচাল জাতি।' অবশেষে পাকিস্তান পুরনো পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে যাবতীয় দুষ্কর্মে চীনের সহায়তা নেবার সিদ্ধান্ত নিল। যদিও চীনের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ আলাদা আদর্শে পরিচালিত, তবু তারা ভারতের প্রতি একই ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের কারণে ইসলামাবাদে চুক্তি স্বাক্ষর করল।

www.pathagar.com

১৯৬৫'র এপ্রিল মাসে পাকিস্তান কচ্ছের রান-এ ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আক্রমণ করল এবং সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হতে অগ্রসর হলো। ভারতের দুর্বলতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে আইয়ুব খান আর তার সহকর্মীরা প্রবল গতিতে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা ১৯৬৫'র আগস্টে কাশ্মীর উপত্যকায় গেরিলাদের পাঠাল। লক্ষ্য ছিল বেসামরিক এবং সামরিক প্রশাসনে ব্যাপক অস্থিরতা আনা এবং সাধারণ মুসলমানদের উত্তেজিত করা। এতে করে কাশ্মীরকে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে কেড়ে নেয়া সহজ হবে বলে তারা ভেবেছিল।

শ্রীনগরের স্থানীয় প্রশাসন প্রথমে এই অনুপ্রবেশের গুরুত্ব অথবা এর পেছনে যে বিশাল পরিকল্পনা কাজ করছে তা অনুধাবন করতে পারেনি। ইন্দিরা গান্ধী নিজেই এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভেতর ছুটি কাটাতে মনস্থ করলেন। নিজস্ব নিরাপত্তার বিষয়ে বেপরোয়া হয়ে অনুপ্রবেশকারীদের চলাচলের পথে তিনি নিজেই গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবং বাস্তব অবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাঁর তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষন তিনি নতুন দিল্লীকে অবহিত করলেন। তাতে তিনি জানালেন যে, এটা কোন run of the mill ক্ষণস্থায়ী সহিংসতার বিষয় নয়। বরং বিশাল একটা উচ্চাভিলাসী আকাঙ্ক্ষার সূচনা মাত্র।

তাঁর অনুমান সঠিক প্রমাণিত হল যে মুহূর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে সীমান্ত পথগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিল, ঠিক তক্ষুনি পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক এবং যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ফিরে এসে আকনূর-চম্ব করিডোরের ভেতর দিয়ে কাশ্মীর এবং লাদাখ অভিমুখী ভারতের একটি প্রধান রাস্তা কেটে দেবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ফাঁদে ফেলতে উত্তরে তাদের আলাদা করে ফেলা দরকার ছিল। কিন্তু লাল বাহাদুর শাস্ত্রী গুরুত্বের সাথে ব্যাপারটা গ্রহণ করলেন। তিনি দ্রুত তাঁর জেনারেলদের পরামর্শ অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক সীমা-রেখা অতিক্রম করে পাকিস্তানে ঢুকে পড়তে অনুমতি দিলেন। সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে যুদ্ধের এই নতুন ফ্রন্ট সৃষ্টির ফলে আকনূর এবং কাশ্মীরের ওপর থেকে চাপ সরে গেল।

যাহোক, পাকিস্তানের আস্তিনে আরও একটি তাস মজুত ছিল। তাদের গেরিলা-বাহিনীর সামরিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং একই সাথে আকনূর-চম্ব এলাকা দখলে ব্যর্থতার পর ইসলামাবাদ তাদের পরিকল্পনার প্রধান অংশ হিসেবে শক্তি প্রয়োগে অগ্রসর হল। তারা যুদ্ধযান নিয়ে দক্ষিণ পাঞ্জাবের সমতল ভূমিতে জোর করে ঢুকে পড়ল। ফলস্বরূপ এই যুদ্ধে

www.pathagar.com

ক্যাশাপ-ক্ষেমকারণ এলাকা ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের চরম অবস্থায় পরিণত হল। ভারতের উচ্চতর কৌশল, নেতৃত্ব এবং প্রশিক্ষণের ফলে পাকিস্তান উন্নত ধরণের যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ব্যর্থতা বরণ করে। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত তীব্র ছিল যে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ থেকে শুরু করে তখন পর্যন্ত তা ছিল বৃহত্তম ট্যাঙ্ক যুদ্ধ। ভারত চূড়ান্ত ভাবে জয়ী হল। কিন্তু তা ছিল শ্বাসরুদ্ধকর। যেমনটি ওয়াটারলু যুদ্ধে আয়রন ডিউক তাঁর জয়ের ব্যাপারে বর্ননা দিয়েছেন। সেটা যে কতটা শ্বাসরোধী ছিল লেখক এবং সমালোচক প্রাণ চোপরা পরবর্তীকালে তা স্পষ্ট করেছেন : "একজন কর্মকর্তা উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি বলেছেন যে একদিন আমরা আন্দাজ করলাম যে লাহোরের দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারব কি না, পরের দিনই আন্দাজ করতে হলো অমৃতসর ধরে রাখা যাবে কি না।"

এটা স্পষ্ট ছিল যে পাকিস্তানের সামর্থ শেষ হয়ে গেছে। তাদের বৈরীতা প্রকাশের তিন সপ্তাহের ভেতর আইয়ুব খান জাতিসংঘের যুদ্ধ-বিরতি'র আহ্বান মেনে নিলেন। যাহোক, এই সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি স্থায়ী শান্তির রূপ নিল সোভিয়েত রাশিয়ার শুভ উদ্যোগের ফলে। যুদ্ধের দল দু'টিকে তাসখন্দে নিয়ে আসা হল। আইয়ুব খান এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রী দু'জনে এক মত হয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। কিন্তু ১৯৬৬'র জানুয়ারী ১১ তারিখের সেই রাতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

ভারত আবারও উত্তরাধিকার সঙ্কটে আক্রান্ত হল। জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর তাঁর শূন্যপদের জন্যে তখন অনুচিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। মোরারজী দেশাই এবং গুলজারী লাল নন্দের মত রাজনীতিকরা, যারা কখনো গান্ধীবাদী আদর্শ এবং সততা'র গুণগান করতে ক্লান্ত হননি,তাঁরাও অশোভন ভাবে যার যার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা শুরু করেছিলেন। পরিণামে তিনজন শক্তিমান কংগ্রেসী, কামরাজ নাদার, অতুল্য ঘোষ এবং এস. কে. পাতিল, সিন্ডিকেট নামে যারা পরিচিত, এই দাবিদার দু'জনকে অগ্রাহ্য করে তাদের পরিবর্তে শাস্ত্রীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন।

এরপর শাস্ত্রীর আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত প্রস্থানের পর সেই সঙ্কট আরও তীব্র ভাবে দেখা দিল। যা একটা বাজে চলচ্চিত্র পুনঃপ্রচারের মত। ক্যাসিয়াসের (Cassius) মত মোরারজী দেশাই ক্ষমতার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। তিনি এমন আচরণ শুরু করলেন যেন ভারতীয় নেতৃত্বে তাঁর ঐশ্বরিক অধিকার। নন্দও একই ভাবে নিজেকে জাহির করলেন। তিনিও তার কৌশল প্রয়োগে মোটেই পিছপা ছিলেন না।

www.pathagar.com

ইন্দিরা গান্ধী শান্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম ক'দিনের একান্ত আলাপ-আলোচনায় তাঁর নাম অতি স্বল্পই উচ্চারিত হয়েছে। কামরাজ হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর নাম প্রস্তাব করার ব্যাপারে রাজী হওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি রাজী হন। জাতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের সমর্থনের স্রোত মৃদু গতিতে তাঁর দিকে বইছিলো। কামরাজের প্রেরণায় রাজ্যের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁকে সমর্থন দিলেন। নন্দ'র প্রচারণা অর্থহীন কোলাহলে রূপ নিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু দেশাই যুদ্ধটা চালিয়ে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী ইন্দিরার পদপ্রার্থীতায় সমর্থন দেয়ায় তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি এটাকে এক ধরনের দমন নীতি বলে ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি কংগ্রেসের এম.পি-দের কাছে দীর্ঘ চিঠি লিখে লিখে তাঁকে সমর্থন দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। অধিকাংশের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে টেলিফোন করে তিনি তাগাদা অব্যাহত রাখলেন। কামরাজ সম্পর্ক তিনি রুক্ষভাবে শ্লেষ করতেন; ইন্দিরাকে বলতেন "কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের প্রার্থী"; আর নিজেকে বলতেন "এম.পি-দের প্রার্থী।" তিনি উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, "আমি আশা করি জাতীয় স্বার্থে সংসদ সদস্যরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগে যথেষ্ট সচেতন।" ইন্দিরা বরাবর একটা মর্যাদাপূর্ণ নীরবতা বজায় রাখলেন। আর এম.পি.'রা তাঁকে ১৬৯ ভোট এবং ইন্দিরাকে ৩৫৫ ভোট দিয়ে স্বচ্ছন্দে জিতিয়ে দিয়ে স্রেফ দেখিয়ে দিলেন তাঁরা কত সচেতন।

ইন্দিরা গান্ধী যাত্রা শুরু করতে চাইলেন তাঁর মন্ত্রীসভা থেকে কিছু প্রবীন-দের অপসারণের মাধ্যমে। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গুলজারী লাল নন্দ। এই সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্যে তাঁর ওপর প্রচন্ড চাপ এলো। নন্দ রক্ষা পেলেন। দেশে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ফলনের পর তিনি যখন রপ্তানী বাড়াবার জন্য রূপীর ৫৭ শতাংশ অবমূল্যায়ন করলেন, কামরাজ তখন সমালোচনা করলেন, যদিও তখন সরকারে তাঁর কোন আসন ছিল না। তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর পরামর্শ নেয়া হবে। এ ছাড়াও সিন্ডিকেট থেকে অমার্জিত ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হল যে তাঁর অবস্থানের জন্য তিনি তাঁদের সমর্থনের কাছে ঋণী।

সংসদের ভেতরে তিনি অবিরত অবমাননাকর ব্যবহার এবং ড. রাম মনহর লোহিয়া আর তাঁর বিশ্বস্ত মোসাহেব রাজ নারায়নের ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার হতেন। এরা দু'জন নেহেরু পরিবারের প্রতি কঠিন ভাবে শত্রুতাপরায়ন ছিলেন। সংসদের বাইরে ছিল হিন্দু পুনর্জাগরণতন্ত্রীদের শক্তি। তারা হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের দুই অংশের মধ্যে যথাক্রমে হিন্দু এবং শিখ কর্তৃত্ব নিয়ে শুরু থেকেই ঝগড়া-কলহের জন্যে মুখিয়ে ছিল। তারা

www.pathagar.com

শক্তিকে সংহত করেছিল গো-হত্যা বন্ধের দাবির পক্ষে সরকারকে ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যে।

হিন্দু সাধুর দল লোকসভার সামনে অবস্থান নিয়ে হিংসাত্মক কর্মকান্ডের উদ্যোগ নিলে পুলিশ গুলি ছুড়তে বাধ্য হয় এবং তিনজন উদ্যোক্তা নিহত হয়। ইন্দিরা গান্ধী খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন। তিনি নন্দকে বরখাস্ত করলেন। নন্দ'র সাথে এই সব সাধু এবং প্রাচীন মানসিকতার মানুষদের গভীর সম্পর্কের কথা সবারই জানা ছিল। তাঁকে জানানো হয়েছিল যে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবেন না যদি তিনি এই রকম সন্দেহপূর্ণ যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখেন। যে সিন্ডিকেট নন্দ'র সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং লৌকিকতাবর্জিত সম্পর্ক রেখে চলত তারা তাঁর বরখাস্তের ঘটনায় অসন্তুষ্ট হল।

এরাই এক সময় শাস্ত্রীকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল তাদের ইচ্ছে মত তারা তাকে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু অল্প সময়ের ভেতরেই তারা বুঝতে পেরেছিল শাস্ত্রীর বাইরের নম্রতার আড়ালে তাঁর নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সময়ে তিনি সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধীর বেলায় সিন্ডিকেট আরও বেশী নিশ্চিত ছিল যে এবার তারা আরো নমনীয় একটি মন্ত্রীকে নির্বাচিত করেছে। কিন্তু তাঁর কর্মকালের প্রথম বছরেই প্রমাণিত হয়েছিল জলের পরিবর্তে তাঁর অগ্নিময়তা। আর এ আগুন তাঁর ভেতরের ইস্পাতকেই শানিত করছিল।

সংসদীয় বিতর্ক এবং সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর দ্বিধা এবং স্বচ্ছন্দহীনতার আবরণ অবশ্যই একটা ব্যাপার ছিল। অনেক বছর আগে জার্মান লেখক আর্নেস্ট ট্রলার-এর (Ernest Troller) বিধবা পত্নী ফ্রাউ ট্রলার জওহরলাল নেহেরুকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে ইন্দিরার সাথে তার একটি সাক্ষাৎকারের বর্ণনা ছিল। ফ্রাউ ট্রলার লিখেছিলেন, "তাঁকে আমার ছোট্ট একটি ফুলের মত মনে হয়েছে। যার ওপর দিয়ে খুব সহজেই ঝোড়ো বাতাস বয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে সে ঝড়কে ভয় পায় না।" সিন্ডিকেটসহ ইন্দিরা গান্ধীর দেশ বিদেশের শত্রুরা এ কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন সরাসরি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

১৯৬৬ কাটলো বিষন্নতায়। সেবারও অজন্মা হল। সিন্ডিকেটের মারাত্মক শত্রুতা এবং কংগ্রেসের ভেতর থেকে বার বার বিরোধিতার ফলে সংসদের ওপর তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। বাইরের দৃশ্যপটও ছিল প্রায় হতাশাব্যঞ্জক। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের অচলাবস্থা ঘুচছিলো না। চীন

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তার পিঠ পৃথিবীর দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর ইউনাইটেড স্টেটস-এর জনসন প্রশাসন ওয়াশিংটনে তাঁকে যে উষ্ণ সম্বর্ধনা দিয়েছিল, সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে সব তিক্ত হয়ে বদলে গেল যখন ইন্দিরা গান্ধী উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধের আহ্বান জানালেন। আমেরিকার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেল যখন তিনি প্রেসিডেন্ট হো চি মিন-কে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠালেন।

১৯৬৭'র ফেব্রুয়ারীর শেষ থেকে মার্চের প্রথমাংশ জুড়ে ছিল নির্বাচনী কাল। প্রবল খাদ্য-সঙ্কটের ফলে দেশের দশ কোটি মানুষ তখন ছিল দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবার ঝুঁকির মুখে এবং হতাশার আচ্ছাদন থেকে লন্ডনের "টাইমস" পত্রিকা'র প্রতিনিধি ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে ভারতে এটা শেষ মুক্ত নির্বাচন হতে পারে।

ভারতের দুর্ভাগ্য চরমে উঠল। ইন্দিরা গান্ধী প্রচন্ড ভাবে প্রচার অভিযানে নামলেন। ৩৫,০০০ মাইল জুড়ে দাপিয়ে বেড়ালেন। কখনো খোলা জীপে। উড়িষ্যার একটি জনসভায় একটি পাথর এসে তার মুখে আঘাত করল। তাঁর নাক ভেঙ্গে গেল। রক্তের অবিরল ধারা ভিজিয়ে দিতে লাগল তার শাড়ি। তবু তিনি বক্তৃতা থামালেন না। নিস্তব্ধ জনতা বিস্মিত হল তাঁর সাহস এবং দৃঢ় সংকল্প দেখে। এটা স্পষ্ট ছিল যে প্রচার অভিযানে তিনি ছিলেন মধ্যমণি। তাঁর অফিসে সারা দেশের কংগ্রেসের ইউনিটগুলো থেকে অবিরল ধারায় ডাক আসতে থাকলো নির্বাচনী সমাবেশে তার অংশ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়ে।

নির্বাচনের ফলাফল প্রধান মন্ত্রীর জন্য ব্যক্তিগত বিজয় ডেকে আনল, কিন্তু পার্টিকে পেছনে ঠেলে দিল। তাঁর কর্তৃত্ব এবং অটলতা প্রবলভাবে বেড়ে গেল। সিন্ডিকেট পরাজিত হল। কামরাজ মাদ্রাজে, পশ্চিম বাংলায় ঘোষ, বোম্বেতে পাতিল এবং উত্তর প্রদেশে সি.বি. গুপ্ত তাঁদের আসন হারালেন। যেহেতু তাঁদের হাতে ক্ষমতা ছিল, এই পরাজয় বিশেষ করে তাঁদের জন্য প্রচন্ড একটা আঘাত ছিল। তাদের অনুসারীরাও ভাল অবস্থায় ছিল না। সিন্ডিকেটের উচ্চ পর্য্যায়ের মাত্র দু'জন সদস্য, অন্ধ্র প্রদেশের সঞ্জীব রেড্ডি এবং কর্ণাটকের এস. নিজালিনগাপ্পা কেবল অক্ষত রইলেন।

মোরারজী দেশাই তিন বছরের মধ্যে তৃতীয় বারের মত প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিলেন এবং যথারীতি হারলেন। সিন্ডিকেটের সমর্থন পাবার জন্য তাঁর উদ্যোগ সামান্যই আশার সঞ্চার করেছিল। বরং তাদের দুর্ব্যবহার তাঁকে হতবুদ্ধি এবং দুর্বল করে ফেলে। কিন্তু লোকসভায় অনির্ভরশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং পরিবর্তনশীল স্বভাবের

www.pathagar.com

জন্য কুখ্যাত কিছু কিছু বিশিষ্ট কংগ্রেস সদস্যদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সম্ভাব্যতার কারণে ইন্দিরা গান্ধী দেশাই-এর প্রতি তাঁর প্রবল ক্রোধ থাকা সত্ত্বেও কোন দ্বন্দের চূড়ান্তে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। দেশাই-এর দিকে থেকেও এ উপলব্ধি ছিল যে সিন্ডিকেট তার পূর্ব অবস্থার ছায়ায় পরিণত হয়েছে। তিনি যদি এই সঙ্কট মুহূর্তে কোন ঝুঁকি নিয়ে পরাস্ত হন তবে তা তাঁর সরকারে টিঁকে থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার সঙ্কেত হিসেবে পরিগণিত হবে। সুতরাং উভয় পক্ষই আপোষের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মোরারজী দেশাই মন্ত্রী সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আসন পেলেন।

প্রথম দিকে তাঁদের কাজকর্ম যার যার জায়গায় ভালই চলছিল। দেশাই ছিলেন একজন অভিজ্ঞ প্রশাসক এবং একজন সাংসদ। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর কিছু কিছু দায়িত্ব নিজের ওপর নিলেন। তারা পরস্পর সহযোগী হয়ে রাষ্ট্রপতি পদে ড. জাকির হোসেনকে নির্বাচিত করার জন্যেও কাজ করলেন। তিনি ছিলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের উত্তরাধিকারী। ড. রাধাকৃষ্ণণ তাঁর ৫ বৎসর সময়কাল শেষে অবসরে যাচ্ছিলেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে একজন সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য প্রার্থীর নাম প্রকাশের জন্য ঐক্যের প্রয়োজন ছিল। যেহেতু ভারতীয় রাষ্ট্রপতির কাজ হচ্ছে প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক এবং দায়িত্ব হচ্ছে বৃটিশ রাজার মত তাঁর মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসরণ করা।

বিরোধী দল সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কোকা সুব্বা রাও-কে পদত্যাগ করে তাদের মনোনীত প্রার্থী হওয়ার জন্য রাজী করিয়ে এই অলিখিত আইন নস্যাৎ করে দেয়। যে কোন বিচারে এটা ছিল একটা অদূরদর্শিতা যা বিচার-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যের সুনামকে ক্রমশঃ দুর্বল করে ফেলেছিল। এবং একই সাথে বিরোধী দল যে দেশের সুদূর প্রসারী স্বার্থ বুঝতে অক্ষম, সে বিষয়টিও অনাবৃত হয়ে পড়েছিল।

ইন্দিরা গান্ধী এবং মি. দেশাই দু'জনই বিষয়টির অন্যায্যতা বুঝতে পারছিলেন। তাঁরা এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে উপ-রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হোসেনেরই রাষ্ট্রপতি'র উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত যেমনটি ড. রাধাকৃষ্ণণ তাঁর সময়ে হয়েছিলেন। এ ছাড়াও ড. হোসেন একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ এবং স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সঙ্কটে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরই দেশের এক নম্বর ব্যক্তি হওয়া উচিত। একই সাথে তিনি একজন মুসলমান। এটাও অনুভূত হয়েছিল যে তাঁর অন্য সব গুণাবলীর সাথে এটাও একটা ভাল দিক। এতে করে স্পষ্ট হবে যে ভারতে সংখ্যালঘুদের সাথে ভাল আচরণ করা হয় এবং মেধানুসারে মর্যাদা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

যা'হোক কর্মক্ষেত্রের এই সম্পর্ক পারস্পারিক বিরক্তি এবং মতানৈক্যের কারণে দ্রুত ভেঙ্গে গেল। দেশাই পশ্চিম বাংলা এবং কেরালার কমিউনিস্ট সরকারকে শ্রমিক-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ওকালতি করেন। ইন্দিরা গান্ধী চান আপসমূলক আচরণ এই যুক্তিতে যে কেন্দ্রে তাঁর বামপন্থীদের সমর্থন প্রয়োজন। কারণ সেখানে ডানপন্থীদের দিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আসছিল।

মত-পার্থক্যের আর একটি বিষয় হল জাতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দী প্রচলনের প্রশ্নে। দক্ষিণের ইংরেজী ভাষার দাবির বিষয়ে তাদের পক্ষে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে দেশাই রাজী ছিলেন না। সেখানকার অফিস-আদালতে 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসাবে ইংরেজীর জায়গায় হিন্দী প্রচলনের সিদ্ধান্তে মাদ্রাজে এক সময় জনগণের আবেগপূর্ণ সহিংসতার ঘটনা ঘটে। কেবল ইন্দিরা গান্ধী সেখানে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দিলে রাজনৈতিক উত্তেজনা কমে আসে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি এখন বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে তাঁর কথা রক্ষার্থে প্রস্তুত। যদিও তিনি জানতেন, এর ফলে উত্তর অঞ্চলের সংখ্যাগুরু হিন্দীভাষীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে। তিনি নিজেই ছিলেন হিন্দীভাষী। অপরপক্ষে দেশাই-এর মাতৃভাষা ছিল গুজরাতী। কিন্তু তিনি তা' করেছিলেন এ কারনে যে "কাউকে না কাউকে তো বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে হবে।" তাঁর এই প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে সরকারী ভাষা এ্যাক্ট–১৯৬৭। জওহর লাল নেহেরুর ভাষায় যা "ভারতের যে কোন অংশের যত দিন প্রয়োজন, তত দিন সহযোগী ভাষা হিসেবে" ইংরেজীকে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

প্রধান যে বিষয়টি তাদের মতান্তরের শেষ সীমা অতিক্রম করল সেটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ব্যাঙ্ক সরকারীকরণ। তিনি ১৯৬৯'র শুরু থেকেই এমন একটা উপায়ের কথা ভাবছিলেন যাতে ছোট ছোট উদ্যেক্তা, ব্যবসায়ী এবং কৃষকরা সহজে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এরা চলমান ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রচণ্ড প্রয়োজনেও মূলধন সংগ্রহে সমর্থ হয় না। এ ব্যাপারেও মোরারজী দেশাই তার বিপক্ষে ছিলেন। তবে এ ভাবে তিনি আপোষ করতে সম্মত ছিলেন যে একটা তত্ত্বাবধায়ক কমিটি থাকবে যারা সমাজের স্বল্প-সুবিধাভোগী অংশকে সহজে ঋণ দেবার ব্যাপারে ব্যাঙ্ককে চাপ দেবে।

অন্য একটি বিষয় তখন চরম রূপ নিয়েছিল সে বছরই মে মাসে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। তাঁর উত্তরাধিকার নির্বাচনের ব্যাপারে আবারও ইন্দিরা গান্ধী, সিন্ডিকেট এবং কংগ্রেসের অন্যান্য পুরনো সদস্যদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা'র বিষয়টি সামনে এল।

www.pathagar.com

যথারীতি তিনি দক্ষিণের শ্রমিক নেতা উপরাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরিকে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তি এবং অনুরোধে কেউ কর্ণপাত করল না। বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের বৈঠকে তাঁকে সুকৌশলে পরাভূত করে দক্ষিণ অন্ধ্র প্রদেশের সিন্ডিকেট সদস্য সঞ্জীব রেড্ডিকে নির্বাচন করা হল। অবমানিত ইন্দিরা গান্ধী অনিচ্ছা সত্ত্বে তা উপস্থাপন করতে বাধ্য হলেন। দ্রুত বিষয়টি স্পষ্ট হল যে আগত সঙ্কটের ভূমি খুব ভাল ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। মাইশোরের সিন্ডিকেট নেতা এস. নিজালিনগাপ্পা মার্চ ১২, ১৯৬৯ তারিখে তাঁর ডায়রীতে লিখলেন, "প্রধান মন্ত্রী হিসেবে তিনি থেকে যেতে চান কি না, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। সম্ভবতঃ অচিরেই একটি শক্তির পরীক্ষা হবে।" কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁর ডায়রী থেকে পাওয়া গেছে যে তিনি দেশাই এর সাথে "প্রধানমন্ত্রীর অপসারণের প্রয়োজনীয়তা"র বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রধান মন্ত্রীত্বের জন্যে তিনিই যে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, দেশাই-এর এ বিশ্বাস অব্যাহত ছিল। সেই সাথে তিনি এও বললেন যে সরকারে তাঁর অবিরত উপস্থিতি না থাকলে "মহিলাটি কম্যুনিস্টদের কাছে দেশ বিক্রি করে দেবে।"

প্রতিদ্বন্দীদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে প্রধানমন্ত্রী বাঘিনীর মত যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন। গিরিকে জয়ী করবার জন্য প্রচার কাজে তিনি সর্ব উপায়ে চেষ্টা করলেন। দক্ষিণের ডি.এম.কে'র মত আঞ্চলিক দলগুলোর কাছে, শিখ আকালী দলের কাছে, দু'টি কম্যুনিস্ট দল সিপিআই এবং সিপিআই(এম), সবার কাছে সমর্থনের আহ্বান জানালেন। অবশেষে সামান্য ব্যবধানে গিরি জয়ী হলেন।

এই বিজয় নব উদ্যমে কংগ্রেসদলীয় বিধান সভার সদস্যদের ইন্দিরার চারপাশে এনে জড়ো করল। সিন্ডিকেটের কষাঘাতের ভয়ে যারা ভীত ছিল,তারাও তখন বিজয়ীর কাছে অটল আনুগত্য প্রকাশের জন্য ভিড় করলেন। লোকসভার ২৭৯জন কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ২০৪জনই ইন্দিরার সাথে ছিলেন।

দেশাইকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্ত করা হল। কিন্তু মন্ত্রীসভায় থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল। অবশ্যই তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এটা ছিল একটা চাল। তিনি যদি এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন তাঁর সম্মানের শেষ কণাটুকুও শূন্যে বিলীন হয়ে যেত। একমাত্র সম্মানজনক যে পথ তাঁর জন্য খোলা ছিল, সেটা হল পদত্যাগ করা। ইতিমধ্যে ১৪টি শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণের সরকারী অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করে গিরি তাঁর

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ রাখলেন। ব্যাঙ্কগুলোর সম্পদের পরিমান ছিল ৫০০ কোটি রুপী অথবা ৬৬.৬ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলারের সমান। ইন্দিরা গান্ধী তখন সময়ের সম্রাজ্ঞী। রাজধানীতে হাজার হাজার স্কুটার-রিক্সা ড্রাইভার, ক্ষুদ্র শিল্পপতি, কেরানী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক—একেবারে জনারন্য তাঁর ফটকের সামনে। তারা হলুদ গাঁদা আর রজনীগন্ধার মালা এবং মিষ্টি নিয়ে তাঁর জয়ধ্বনি দিতে থাকল।

১৯৬৯'র নভেম্বর মাসে ইন্দিরা গান্ধীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর অর্থ হল তখন দুটো কংগ্রেস এবং দুটো দলই মূল কংগ্রেসের দাবিদার। জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থানরত ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সরে যাবার কোন প্রশ্নই ছিল না। তিনি এক সময় ভারতের ২৭৮জন রাজকুমারের ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্যে রাষ্ট্র থেকে বরাদ্দ করা ভাতা লোপ করার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে উথাপন করেছিলেন। এটা ছিল বৃটিশদের নিয়ম-বহির্ভূত একটি প্রথা। ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বরে তিনি সংসদীয় বিলের মাধ্যমে সংবিধি বইতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে বিষয়টি আবারও সামনে নিয়ে এলেন।

মনে রাখা ভাল যে এই অর্থ করমুক্ত ছিল। পরিকল্পিত কর্মকান্ডের ভেতর তাঁর এই ধরনের অনন্য নিজস্বতার একটি ছিল আমদানীকৃত বিদেশী পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক-কর বিলোপ করা। যা হোক উক্ত ভাতা ছিল এক এক জনের জন্য এক এক রকম। উদাহরণ স্বরূপ, মহীশূরের মহারাজা বছরে পেতেন ৬০ লক্ষ রুপী বা ৩৫০,০০০ ইউ.এস. ডলার, অন্য দিকে কাতাদিয়ার তালুকদাররা পেতেন মাত্র ৩০০ রুপী বা ২৫ ডলার। কিন্তু সরকারী অর্থ দপ্তরে মোট জমা পড়ল ১ কোটি রুপী বা ৬ মিলিয়ন ডলার। একটি দরিদ্র দেশের জন্যে যথেষ্ট বড় একটা অঙ্ক।

রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এর ব্যপ্তি ছিল শিক্ষনীয়। এতে করে দেশের বিপুল এক শ্রেণীর পরজীবিদের অস্তিত্বের প্রতি সাধারনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, তেল জল দিয়ে যাদের মোটাতাজা রাখা হচ্ছে, যাদের জীবনযাত্রার ধরন এই গণতান্ত্রিক দেশের আদর্শের অনুকুল নয়।

প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে বিলটি লোকসভায় পাশ হয়ে গেল। কিন্তু অল্পের জন্যে উচ্চ পরিষদে পাশ হল না। যা'হোক মি. গিরি রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতানুযায়ী একটি অধ্যাদেশ জারী করলেন, যা বিলটিকে আইনে পরিণত করল।

বিপক্ষরা সাংঘাতিকভাবে আক্রমণে উদ্যত হল। তারা রাজসিক মিত্রতায় আবদ্ধ হয়ে সুপ্রীম কোর্টে মামলা রুজু করল। ১৯৭০ সনের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে সরকারী বিলোপ-আদেশ অকার্যকর ঘোষণা করা হল এবং

www.pathagar.com

ইন্দিরা গান্ধী রাজকুমারদের যে সব সুযোগ সুবিধা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, সেগুলো তাদের ফেরৎ দিতে বলা হল।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হারবার পাত্রী ছিলো না। অকস্মাৎ তিনি ১৯৭১-এর মার্চে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। পুরো এক বছর আগে তিনি নির্বাচনে গেলেন। প্রতিপক্ষ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ভীষণভাবে তারা আপত্তি জানালো। কিন্তু যতখানি সম্ভব যোগ্যভাবে যুদ্ধ করা ছাড়া তাদের আর কিছু করবার ছিল না। ফলাফল হল নাটকীয়। সংসদে ৫২৫টি আসনের ভেতর ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস পেল ৩৫৫টি। দেশাই-এর কংগ্রেস গ্রুপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ২৩৮টি আসনে। মাত্র ১৬টাতে তারা জয়ী হল। তাদের ডানপক্ষীয় মিত্রদেরও একই অবস্থা হল।

রাজকুমারদের সলিল সমাধি ঘটল। ইন্দিরা গান্ধী চিরতরে সিন্ডিকেটের ফাঁস কেটে বেরিয়ে গেলেন। যারা তাঁকে অফিসের ভেতর বসিয়ে রাখতে চায় দলের সেই সব কর্তৃত্বপরায়ন লোকদের থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিলেন তিনি। এ বিজয় ছিল তার একার। তাঁর চার বছরের অগ্নিপরীক্ষার অবসান হল। তিনি শক্তিময়ী এবং অলঙ্ঘনীয়রূপে আবির্ভূত হলেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

বিজয় এবং অবক্ষয়

বর্হির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউ. এস. লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস-এর প্রতিবেদন থেকে একটি উদ্ধৃতি, "১৯৭০'র প্রারম্ভে ভারতের সামান্যই ধারণা ছিল যে আসছে বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার ভূমিকা কী হবে।"

এই প্রতিবেদনে একটা অবচেতন ব্যাজস্তুতি ছিল। কারণ এক বছরের ভেতরই উপমহাদেশের ক্ষমতার ভারসাম্য মূলতঃ ভারতের পক্ষে এসে যায়। এবং সেই থেকে ধীরে ধীরে তার একটা অনুরণন অন্যত্রও ভারতীয় প্রভাবকে বাড়িয়ে তোলে।

তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন ঘটে ১৯৭০-এর নভেম্বরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যখন প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। সাথে নিয়ে আসে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস, যা প্রচণ্ড প্রাণহানি এবং ধ্বংসের কারণ হয়। দশ লক্ষ বাঙ্গালী ধ্বংসের মুখোমুখি হয় এবং একই সংখ্যক বাঙ্গালী তাদের ঘরবাড়িসহ সব কিছু হারায়। পাকিস্তান সরকার ১,০০০ মাইল দূরে ইসলামাবাদ থেকে খুব মন্থরভাবে বিষয়টাতে উদ্যোগী হয়। এমন কি আন্তর্জাতিক সাহায্যের বিষয়েও। ভারত ৫০টি হেলিকপ্টার ক্রুসহ দেবার প্রস্তাব করে। নিরাপত্তার অজুহাতে তা' প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রদেশের সাধারণ নির্বাচনে এই ধূমায়িত অসন্তোষ এতই বিস্ফোরণমুখ হয়ে ওঠে যে সামরিক একনায়ক জে. ইয়াহিয়া খান প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য হন যে বেসামরিক গণতান্ত্রিক আইন তিনি ফিরিয়ে দেবেন।

১৯৫৮ থেকেই পাকিস্তানে সামরিক একনায়কতন্ত্র চলে আসছিল। ১৯৬৮-তে অস্থিরতা চরমে পৌঁছালে আইয়ুব খানের দশকের সমাপ্তি ঘটে। ফিল্ড মার্শাল গদী ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯৬৯'র মার্চে তার জায়গায় অধিষ্ঠিত হন তারই সমগোত্রীয় জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

নির্বাচনের ফলাফল জেনারেল এবং তার কুচক্রী সহযোগীদের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। আওয়ামী লীগ বাংলার সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তাদের বহু দশকের সংগ্রামের ঐতিহ্য

www.pathagar.com

নিয়ে ঝড়ের মত ভয়ঙ্কর শক্তিমান হয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়। ১৫৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৫১টি আসন তারা অধিকার করে। বন্যাপ্লাবিত এলাকার ৯-টি আসনের সিদ্ধান্ত তখনও স্থগিত ছিল কিন্তু তা-ও সংরক্ষিত ছিল আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্যে। মহিলাদের ৭-টি মনোনীত আসনসহ দুই পাকিস্তানের ৩১৩-টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ সর্বমোট ১৬৭-টি আসন লাভ করে। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮-টি আসনের মধ্যে ৮২-টিতে জয়লাভ করে।

ইয়াহিয়া অথবা ভুট্টো, দুজনার কেউই শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন সরকারের অস্তিত্ব কল্পনা করতেও প্রস্তুত ছিলেন না। নতুন সরকারকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে ভুট্টোর অস্বীকৃতির অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন বাতিল করলেন। তার ঘোষণা প্রাথমিক ভাবে প্রচণ্ড ধাক্কা এবং বিস্ময়ের উদ্রেক করল। কিন্তু অচিরেই অনিরুদ্ধ ক্রোধে ফুলে ফেঁপে উঠল। বাঙ্গালীরা বুঝতে পারল যে ১৯৫০'র মতই তাদের আশা-আকাঙ্খাকে ধুলিসাৎ করে দিয়ে তাদের বিজয়ের সাথে আবারও প্রতারণা করা হল। তার ফল হল এই যে ১৯৭১'র মার্চে প্রবল আকারে অসহযোগ এবং গণঅবাধ্যতা শুরু হল এবং তা' ছড়িয়ে পড়ল বিচার বিভাগ এবং সরকারী কর্মচারীদের উচ্চতম ধাপ পর্যন্ত। ইয়াহিয়া খানের জানা একটি মাত্র পথেই তিনি অগ্রসর হলেন। তিনি জেনারেল টিক্কা খানকে পাঠালেন, যিনি পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে তার কর্মকান্ড দ্বারা "বেলুচিস্তানের কসাই" খেতাব পেয়েছেন। তাকে আদেশ দেয়া হল "ওদের খতম কর।"

২৫ মার্চ ১৯৭১'র রাতে প্রবল উৎসাহে তিনি তার দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার দমননীতি এবং নরহত্যা রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু হয়ে ক্রমে ক্রমে শহর-নগর এবং গোটা দেশের জনপদে ছড়িয়ে পড়ল।

খুব দ্রুত আশ্রয়ের খোঁজে ভারত সীমান্তে জনতার ঢল নামল। এই স্রোত বেড়েই চলল সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়িয়ে মাসের পর মাসে। ১৯৭১'র অক্টোবর পর্যন্ত ৯০ লক্ষ বাঙ্গালী–হিন্দু মুসলমান সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে এল। এই সংখ্যা এক মাস পরে এক কোটি ছাড়িয়ে গেল ভারত যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

"সানডে টাইমস"-এর পাকিস্তানের প্রতিনিধি এন্থনি মাসকারেনহাস ইয়াহিয়া খান প্রশাসনের গণহত্যার হিসাবটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। তিনি লিখেছেন, "গণহত্যার লক্ষ্য কারা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" তারা ছিলেন :

www.pathagar.com

১. ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে'র বাঙ্গালী সামরিক সদস্য, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ এবং প্যারা-সামরিক আনছার এবং মুজাহিদদের।
২. হিন্দু সম্প্রদায়–"আমরা কেবল পুরুষ আর নারীকে হত্যা করছি। শিশুদের ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা সৈনিক, কাপুরুষ নই...." আমি কুমিল্লায় শুনেছিলাম।
৩. আওয়ামী লীগ : এই দলের সাথে যুক্ত সবাই, উপর থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ পর্যন্ত।
৪. ছাত্র : কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত মেয়েরা।
৫. অধ্যাপক এবং শিক্ষকদের মত বুদ্ধিজীবিদের বিদ্রোহী হিসেবে যেখানেই হোক মেরে ফেলা।

"......হিন্দুদের বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এ কারণে যে প্রশাসন মনে করত 'হিন্দুরা ভারতের দালাল', তারা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ধ্বংস করতে চায়। সামরিক-বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্য এবং পুলিশদের ওরা হত্যা করছিল, কারণ তারাই একমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল, যারা আর্মির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। অন্যদের তাক্ করা হয়েছে এ কারণে যে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের অখন্ডতার প্রতি হুমকী স্বরূপ।.....'আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা সবরকম হুমকী থেকে মুক্ত করব। তার অর্থ যদি ২০ লক্ষ মানুষ হত্যা এবং ৩০ বছর প্রদেশকে কলোনীর মত শাসন করা, তাহলে তাই করব।' কুমিল্লায় আমাকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল।"

অন্যরা সেখানকার ঘটনাবলীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান এবং জাপানীদের নৃশংসতার স্মৃতিবাহী বলে বর্ণনা করেছেন।

বিস্ফোরণটা ১৯৭১-এ ঘটতে পারে কিন্তু সলতে পুড়ছিল ১৯৪৭-এ ভারত-পাকিস্তান ভাগ হবার সময় থেকেই। অনেকগুলো সঙ্কটের ভেতর সব চেয়ে বড় সঙ্কট ছিল বাঙ্গালীর অস্তিত্বের সঙ্কট, জন্মমুহূর্ত থেকে যা বিদ্যমান। ঘরটা বাঁধা হয়েছিল বালুচরে। পাকিস্তানের অস্তিত্বের কারণ হল ইসলাম। গঠিত হয়েছিল পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচী, পাঠান এবং সংখ্যাগুরু বাঙ্গালীদের নিয়ে যাদের অবস্থান বাকিদের থেকে ১,০০০ মাইল দূরে। অন্য সবার সাথে একটা সাধারণ ইসলামী আদল দেবার জন্যে যাদের সব উদ্যোগের বিরোধিতা করা হয়েছে দমন-নির্যাতন চালিয়ে। এই নতুন জাতির রাজনৈতিক বিকৃতিটা ছড়িয়েছে এমন একটি দৃষ্টিকোন থেকে যা ইসলামের

www.pathagar.com

সংকীর্ণ অযৌক্তিক ব্যাখ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ছুড়ে ফেলে দিল ধর্মের নামে। ফলে ভাবগত দূরত্বের সৃষ্টি হয়ে গেল। এরপর এক বছরের মধ্যে পাকিস্তানের শাসকরা সিদ্ধান্ত নিল যে দেশে একটা মাত্র রাষ্ট্রভাষা থাকবে–উর্দু। ইন্দো-পার্সিয়ান সংস্কৃতির সম্মিলনে উর্দুর উৎপত্তি। উত্তরে মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় এবং তাদের সহযোগী হিন্দু সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের তৎকালীন আদালতের ভাষা হয়ে উঠেছিল উর্দু। ভাষাটির ইসলামিক জন্মবৃত্তান্ত নিষ্কলুষ মনে হল পাকিস্তানীদের কাছে। এবং মোটামুটি একই কারণে বাংলার অমুসলিমদের এবং বাংলা ভাষার উন্নতির পেছনে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের বিশাল অবদানের কারণে পাকিস্তানী নেতৃত্বের চোখে তা' সন্দেহজনক বলে মনে হল। তবু নতুন রাষ্ট্রটির সব চেয়ে বড় অংশ বাঙ্গালী মুসলমানরা, যারা সামান্যই উর্দু জানে এবং ইসলামের প্রতি ঐকান্তিক ভাবে বিশ্বস্ত। মাতৃভাষার প্রশ্নে অনমনীয় ভাবে নিজেদের উৎসর্গ করেছিল তারা।

পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবদমন আরও বাড়িয়ে তুলল নিজেদের স্বার্থে অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা। একই সাথে পূর্ব বাংলাকে তারা কলোনীর মত ব্যবহার করতে চাইল। ১৯৬০-এ বাঙ্গালীকে প্রধানতঃ বাঁচিয়ে রেখেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন মাওপন্থী বাম দল; এরাও একটি বড় দল। সামরিক জান্তাকে তারা সমর্থন দিল, কারণ তারা হচ্ছে চীনের বন্ধু। এই পুরোটা সময় শেখ মুজিবকে ভারত-সমর্থক বলা হয়, যা পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে একটা অমার্জনীয় অপরাধ। কারু দেশপ্রেম মাপা হত ভারত এবং ভারতের নেতাদের সে কতখানি ঘৃণা করে তার মাপকাঠিতে। মুজিব তাঁর নিজের জনগণ, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠির অন্যতম, তাদের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সমঅধিকার দাবি করলেন। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে সামান্য অংশকে ভারত-প্রেমী বলা যেত। কিন্তু তাদের অনুভব প্রায়শঃই সীমান্তের এ পারের বাঙ্গালীদের সাথে একই সংস্কৃতির প্রভাবে এবং সাধারণ বোধের মাপকাঠিতে গভীর ভাবে প্রভাবিত ছিল।

যাহোক, কাশ্মীর ছিল পাকিস্তানীদের ধারাবাহিক ঘৃণার আসল ক্ষেত্র। ১৯৪৭-এ কাশ্মীর উপত্যকায় সশস্ত্র মাসুদ উপজাতিদের প্রেরণ প্রসঙ্গে লর্ড বার্ডউড-এর (Lord Birdwood) বর্ণনা, "সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য এবং বুনোগোষ্ঠির ভেতরেও বন্য" এবং তাদের হিন্দু, খৃষ্টান এবং মুসলমানদের "নির্বিচারে হত্যা" ছিল চূড়ান্ত ভাবে প্রতিহিংসামূলক। তাদের

www.pathagar.com

পাকিস্তান সীমান্ত থেকে সংগ্রহ করে সশস্ত্র করেছিল পাকিস্তান সরকার। তাদের পাশবিক হিংস্রতা কেবল মৃত্যুর চিহ্ন ফেলে গিয়েছিল। যারা তা' প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এমন কী যারা সে সম্পর্কে কেবল পড়েছেন, তারাও সে কথা মনে করে আতঙ্কে কেঁপে ওঠেন। উদাহরণ নেয়া যায় বারামূলা'র খৃষ্টান ক্যাথিড্রাল থেকে। সেটি ওরা পুড়িয়ে দেয় এবং সেখানকার বাসিন্দাদের হত্যা করে। সন্ন্যাসিনী যারা কোন রকমে বেঁচে গিয়েছিলেন, তারা তৎকালীন পরম শ্রদ্ধেয় ভারতীয় সাংবাদিক ফ্রাঙ্ক মোরেস-কে সেদিনের ঘটনা বলেন। “ওরা আমাদের চার্চে ঢুকেছিল অপবিত্র করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। সব ওরা ধ্বংস করেছে, পবিত্র প্রতিমূর্তিগুলো, রুটির পাত্র, পুরোহিতের পোষাক, আর মোমগুলো......তারা সব রকম হাতিয়ার নিয়ে এসেছিল, বন্দুক, তলোয়ার, ছুরি, কুড়াল, বল্লম, রক্তে ভেজা বেয়নেট.....আমাদের কিছু ছিল না যা দিয়ে আমরা তাদের (কর্ণেল এবং মিসেস ডাইক্‌স্‌) জন্যে কবর খুড়তে পারি......একজন হানাদার এসেছিল চিকিৎসা নিতে, তার হাত আবৃত ছিলো অলংকারে। কোথায় সেগুলো পেয়েছে জানতে চাওয়া হলে সে বলল, ‘এগুলো দখল করতে আমি পনেরজন মানুষ হত্যা করেছি।’

সে যাত্রা কাশ্মীর রক্ষা পেয়েছিল। অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক কালিমালিপ্ত হল, যা এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। ১৯৬৫-তে পাকিস্তান দ্বিতীয় বারের মত গেরিলা হামলা চালিয়ে যুদ্ধের ফায়দা লুটতে চাইল। এবারও যখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, তখন অনেক পাকিস্তানীই মনে করল যে দুর্বল নেতৃত্বের কারণে তাদের বিজয় লুণ্ঠিত হয়েছে। জুলফিকার আলী ভুট্টো একজন দক্ষ বাক্যবাগীশ নেতা হিসেবে বিশেষ নাম-করা ছিলেন। জনগণের মন জয়ের জন্য তিনি ঘৃণিত শত্রু ভারতের বিরুদ্ধে ১,০০০ বছরের পবিত্র যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করলেন।

এই হিসেবের মধ্যে পাকিস্তানের প্রধান দুই ভরসাস্থল ছিল আমেরিকা এবং চীন। আমেরিকা ওয়াশিংটন-নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কিত ছিল তার সামরিক-বন্ধুত্বের বৃত্তটা প্রস্তুত করতে অথবা পাকিস্তানকে আমলাতান্ত্রিক প্রয়োজনে ব্যবহার করছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে সংযত রাখার জন্যে। চীনের দিক থেকে, ১৯৫০'র মাঝামাঝিতে ভারতের সঙ্গে যখন তার প্রবল বন্ধুত্ব, তখনও তারা নয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে ভবিষ্যতের অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছিল। পিকিং-এর সাথে আমেরিকার বৈরীতা এবং পাকিস্তান যে আমেরিকার আঞ্চলিক খরিদ্দার এ কথা চীনের জানা থাকা সত্ত্বেও এই ছিল বাস্তবতা।

এ অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১'র মার্চ থেকে কেবল একটি জীঘাংসু

www.pathagar.com

প্রতিবেশিরই মুখোমুখি ছিলেন না, একইসাথে তাঁর শক্তিশালী দু'টি পৃষ্ঠ-পোষকেরও মুখোমুখি ছিলেন। এই সঙ্কট তার মনকে চমৎকার ভাবে সংহত করেছিল। একটি ঝড়ো নির্বাচনী বিজয় তার অভ্যন্তরীণ অবস্থানের পেছনে গোটা দেশের সুদৃঢ় সমর্থনকে নিশ্চিত করেছিল।

সীমান্তে শরনার্থীর ঢল ভারতের অর্থনীতির ওপর বড় আকারের বোঝা হয়ে দেখা দেয়। বিভিন্ন অবস্থান থেকে যুদ্ধ শুরুর আহ্বান জানানো হচ্ছিল। তাদের ভেতরে অন্যতম ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই দাবিকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন এবং সতর্কভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি অচঞ্চলভাবে সামরিক সেনাপ্রধান জেনারেল শ্যাম মানেক শ-কে বিমান এবং নৌ-বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে পাকিস্তানে প্রচণ্ডভাবে আকস্মিক আক্রমণের পরিকল্পনা করে রাখতে বললেন। কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে বিষয়টি নিস্পত্তি করা ছিল তাঁর প্রথম লক্ষ্য। ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম ইউরোপীয় রাজধানীগুলোতে ভ্রমণ করে তাদের জানালেন, ভারতের সমস্যা, বিপাকের গুরুত্ব। তিনি বৃটিশ, ফরাসী এবং পশ্চিম জার্মানীর নেতাদের আহ্বান জানালেন ইয়াহিয়া খানের ওপর তাদের প্রভাব খাটিয়ে কারারুদ্ধ শেখ মুজিবকে মুক্ত করে তাঁর সাথে আলোচনা করতে—কী ভাবে পূর্ব বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় এবং যে-সব শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের দেশে ফেরৎ পাঠানো যায়।

তিনি প্রচুর সহানুভূতির সাথে আপ্যায়িত হলেন, কিন্তু সামান্যই লাভ হল। ইয়াহিয়া খানের ওপর এ সব দেশের সামান্যই প্রভাব ছিল। একমাত্র আমেরিকা পারতো এই আইন-শৃঙ্খলাভঙ্গকারী পাকিস্তানী একনায়কের ওপর প্রয়োজনীয় চাপ প্রয়োগ করতে। কিন্তু তারা তা না করতেই পছন্দ করল। আসল ব্যাপার হলো, নিক্সন এবং কিসিঞ্জার চীনের কাছে তাদের গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। তাদের জন্যে একটি রাস্তা যাবে পিকিং-এ ইসলামাবাদের ওপর দিয়ে। জেনারেল ইয়াহিয়া দুই পক্ষের মধ্যে ডাক-হরকরার কাজ করছিল।

কিসিঞ্জার ১৯৭১-এর জুলাই মাসের মধ্যভাগে ভারতে আসেন পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা নিয়ে লোক-দেখানো আলোচনা করতে। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে তিনি ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝাঁ-কে ভয় দেখাতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁকে হুমকি দেন এই বলে যে যদি চীন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে তা'হলে আমেরিকার তেমন কিছু করার থাকবে না। ভারত সরকার কিসিঞ্জারের শঠতা বিষয়ে পূর্ণ সজাগ ছিল। নয়া দিল্লীতে তাঁর আসাটা ছিল একান্ত নাটুকেপনা। বাঙালী শরণার্থীদের দুর্দশা আর

www.pathagar.com

তাদের আশ্রয়দাতাকে তারা যে গভীর সমস্যায় ফেলেছে, সে সম্বন্ধে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। এ ছাড়াও ভারত সরকার কষে ঝাকুনি খেয়েছিল চীন-আমেরিকার কৌশলগত সহঅবস্থানের বিষয়টি দেখে। কিসিঞ্জার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, চৌ এন-লাই এবং তিনি ভারতের প্রতি একই রকম বিদ্বেষ পোষণ করেন।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিষয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট পরবর্তীকালে যেমনটি বলেছেন, তাঁর চোখে সেটি ছিল প্রধানতঃ "সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থিত বৃহৎ জাতিগুলোর ছোট ছোট প্রতিবেশীদের বিভক্ত হতে অনুমতি দেয়া।" এ প্রসঙ্গে আমেরিকান সাংবাদিক সেমুর হার্শ (Seymour Hersh) তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন : " এই বিশ্লেষন ছিল স্রেফ একটা ভুল, কল্পনার ছায়া মাত্র। চীনের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা নিরাপদ রাখা এবং পরবর্তীতে পিকিং-এ শীর্ষ বৈঠকের জন্য যে কোন মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ হত্যা তো নস্যি। হোয়াইট হাউজ কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থন করাকে যুক্তিসঙ্গত দেখাতেও কিসিঞ্জারের এ ধরণের মন্তব্য যথাযথ ছিল.......।" আমেরিকা এবং চীন কর্তৃক পাকিস্তানকে সমর্থনের বিষয় লিখতে গিয়ে আই.এফ. স্টোন তাঁর সাহসী এবং স্বতন্ত্র লেখনীতে গভীর বেদনা প্রকাশ করেন, "এই পৃথিবী আগেও অনেক বিস্ময়কর শয্যাসঙ্গীদের দেখেছে, কিন্তু এমন বিস্ময়কর এবং রক্তাক্ত শয্যা কখনো দেখেনি।"

ইন্দিরা গান্ধী ভারতের লোকসভায় অমঙ্গলের সতর্ক-সঙ্কেত জ্ঞাপন করলেন ঃ "এই কঠিন মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে বাইরের বিশ্ব অযৌক্তিকভাবে এত বেশী সময় নিচ্ছে যে, এই লোকসভায় আমাকে অতি অবশ্যই আমার হতাশা ব্যক্ত করতে হচ্ছে।" তিনি বললেন, "আমরা নিশ্চিত যে পূর্ব বাংলার সমস্যা সশস্ত্রবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে সমাধান করা যাবে না। ক্ষমতায় বসে যারা এটা করছে তাদের অবশ্যই রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। বিশ্ব জনমত একটি প্রবল শক্তি। সর্বোচ্চ শক্তিমানকেও তা' প্রভাবিত করতে পারে। বড় বড় শক্তিগুলোরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। যদি তারা তাদের শক্তিকে সঠিক এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে, তাহলেই কেবল আমাদের উপমহাদেশে আমরা সুদৃঢ় শান্তির পথে এগিয়ে যেতে পারব। আর যদি তারা ব্যর্থ হয়—আমি বিশ্বস্ত ভাবে আশা করি তারা তা হবে না—তাহলে মানবাধিকার লঙ্ঘন, মানুষকে ছিন্নমূল করা এবং একটা বিশাল জনগোষ্ঠিকে নিরাশ্রয় করার যে অবিরাম প্রক্রিয়া চলছে, তা শান্তির জন্য মারাত্মক হুমকী হয়ে দেখা দেবে।"

www.pathagar.com

১৯৭১-এর নভেম্বর মাসে ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী সমস্যার গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। রিচার্ড নিক্সন তাঁর স্বাগত ভাষণে বিষয়টির উল্লেখ মাত্র করলেন না। তার বদলে তিনি ভারতের আবহাওয়া এবং বন্যার বিষয়ে কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রত্যুত্তর ভাষণে তাঁর দেশ পূর্ব সীমান্তে যে প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সে দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সাক্ষাৎকারও ছিল একই রকম হিম-শীতল। নিক্সন কেবল তাঁর সম্পর্কে বিস্ময়কর একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, 'কুত্তি' (a bitch)। এরপরেও তিনি তাঁর কক্ষ সংলগ্ন ক্ষুদ্র কক্ষে ইন্দিরা গান্ধীকে ৪৫ মিনিট বসিয়ে রেখে অপমান করেন।

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী শান্ত রইলেন। ওয়াশিংটনের তীব্র চাপের মুখে কেবল তাঁর কণ্ঠে প্রবল বিস্ময় এবং ক্রোধ অনুরণিত হল , "সে সময় এখন আর নেই, যখন ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ মাইল দূরে বসে কোন জাতি তাদের উচ্চ বর্ণের অহঙ্কারে ভারতীয়দের আদেশ করত......ভারত বদলে গেছে এবং কোন জাতির আর দাস নয় ভারত। আমরা আজ তাই করব আমাদের জাতির জন্য যা শুভ হবে এবং কখনো তা' করব না তথাকথিত বড় বড় জাতি গোষ্ঠিরা আমাদের দিয়ে যা' করিয়ে নিতে চায়।"

বৈরিতা বিস্ফোরিত হল ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের ৩ তারিখে যখন ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন আটটি ভারতীয় বিমান ঘাটিতে অতর্কিতে হামলা চালালেন। ভারতীয় যুদ্ধাস্ত্রও সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত ছিল। একটি চমৎকার সমরাভিযান, যেখানে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পর যুক্ত ছিল এবং যুদ্ধটা পাকিস্তানের ভূমিতে গিয়ে পৌছাল। যুদ্ধে পশ্চিম রনাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনী বিপুল আধিপত্য বিস্তার করল এবং পূর্ব রনাঙ্গনে বিধ্বংসী অগ্রযাত্রায় জয় লাভ করল—যা ছিল দেশের রাজনৈতিক এবং সামরিক লক্ষ্য। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে জন্ম নিল নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

যুদ্ধের এক সপ্তাহ আগে উচ্চ পর্যায়ের একজন পাকিস্তানী জেনারেল দম্ভোক্তি করেছিল, "আমরা কখনো হারিনি। ইতিহাস খুলে দেখ। আমি চ্যালেঞ্জ করছি জয় ছাড়া সেখানে কিছু নেই। আমরা কখনো হারিনি এবং ভারত কখনো জেতেনি। ওদের তিনজনের বিরুদ্ধে আমাদের একজনই যথেষ্ট।"

ইয়াহিয়া খানের বাগাড়ম্বর ছিল, "আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য আমাদের সাথে আছেন। বীর মুজাহিদদের জন্য সময় এসেছে শত্রুকে

www.pathagar.com

ধ্বংসাত্মক জবাব দেবার। আমরা যথেষ্ট সহ্য করেছি। শত্রুকে আক্রমণ কর। তাদের বল দেশের জন্যে প্রতিটি পাকিস্তানী মরতে প্রস্তুত।"

ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য ছিল মর্যাদাপূর্ণ, "আমাদের দুঃখ এই যে, পাকিস্তান চূড়ান্ত মূঢ়তা প্রকাশ না করে ছাড়ল না, এবং দুঃখ এই যে উপমহাদেশে যখন সব চেয়ে বেশী দরকার উন্নয়নের, তখন ভারত এবং পাকিস্তানের জনগণকে যুদ্ধের ভেতর ঠেলে দেয়া হল। আমরা প্রতিবেশীর মত বসবাস করতে পারতাম কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কখনো এ কথা বলারও সুযোগ হয়নি।"

যুক্তরাষ্ট্র ভারত এবং বাংলাদেশের প্রতিরোধকে ভয় দেখাতে এবং অবরুদ্ধ পাকিস্তানী সৈন্য-বাহিনীকে উদ্ধার করবার জন্যে তাদের বিখ্যাত সপ্তম নৌ-বহর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ঢাকার পতন হল এবং ৯৩,০০০ পাকিস্তানী সৈন্য নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করে বন্দীত্ব বরণ করল। আমেরিকান-বহর তখনও গন্তব্য থেকে বহু দূরে ভাসছে।

চীনও সময় উপযোগী তার ভূমিকা পালন করেছিল। তারা ভারতকে এক ধরনের সতর্ক-বার্তা পাঠাল, যেমনটি বিগত দশকগুলোতে ফরমোজা প্রণালীর বিষয়ে অন্ততঃ ২,০০০ বার তারা যুক্তরাষ্ট্রকে পাঠিয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী তাঁর জয়ের মুহূর্তেও সুস্থির ছিলেন। ফোনটা যখন বাজলো তিনি তখন সুইডিশ টেলিভিশনের জন্যে একটি সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। ফোন করেছিলেন ভারতীয় সেনা প্রধান। তিনি বললেন, "ম্যাডাম, আমরা তাদের হারিয়েছি, তারা আত্মসমর্পণ করেছে। ঢাকার পতন হয়েছে।" তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন, পরদিনই একটি বৈঠক হবে বলে স্থির করলেন এবং সাক্ষাৎকার চালিয়ে গেলেন। এবং সাথে সাথে চলতে থাকলো তাঁর যুক্তির লড়াই, তাঁর সেনা-বাহিনীর সাথে, রাজনৈতিক সহযোগীদের সাথে, বিরোধী পক্ষের নেতাদের সাথে। তারা সবাই সুপারিশ করছিলেন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। আর তিনি চাইছিলেন যথাশীঘ্র যুদ্ধ-বিরতির জন্য তাদের সম্মত করাতে।

স্বাধীনতার সূচনা থেকেই ভারত বাইরের যে সব ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, সে সব মুহূর্তেও ইন্দিরা গান্ধী চমৎকার দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। তিনি অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন এবং তাঁর বিজয়ের সময়গুলোতেও মহানুভব ছিলেন। তিনি পাকিস্তানকে কেটে যথার্থ আকার দিয়েছিলেন। কিন্তু একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন-এর উচ্চতাও হ্রাস করেছিলেন।

এ ভাবেই তিনি ভারতকে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, ১৯৬০-এর

www.pathagar.com

শুরুতে যা হারিয়ে গিয়েছিল, পরবর্তী বছরগুলাতে যার খোঁজে অন্ধের মত হাতড়ে ফিরেছে ভারত। নিক্সন, কিসিঞ্জার, মাও এবং চৌ এন লাই, যাদের একমাত্র নীতি হচ্ছে শক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করা, তাদের তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভারত একটা জাতি, কারু পাপোশ নয়, উজ্জ্বল সূর্যের নীচে তারও থাকার অধিকার আছে।

যুদ্ধ শেষে ইন্দিরা গান্ধী এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সন এই যুদ্ধে পরস্পরের দায়িত্ব সম্পর্কে কঠিন ভাষায় দুটো চিঠি লেনদেন করেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দেশের লক্ষ্য সম্পর্কে তাতে লেখেন, "আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, আমরা কী চাই। আমাদের জন্যে আমরা কিছুই করিনি। যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান, এখন বাংলাদেশ, সেখানকার কোন এলাকা আমরা চাইনি। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের কোন এলাকা চাইনি। আমরা চেয়েছি পাকিস্তানের সাথে স্থায়ী শান্তি। তার বদলে কাশ্মীর নিয়ে গত ২৪ বছর ধরে পাকিস্তান কি আমাদের অন্তহীন অকারণ যন্ত্রণা দিয়ে যাবে? তারা কি ভারতের প্রতি তাদের ঘৃণ্য প্রচারণা আর অবিরত শত্রুতা চালিয়ে যেতে চায়? কত বার আমার পিতা এবং আমি পাকিস্তানের কাছে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রস্তাব করেছি। এটা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে প্রত্যেক বার পাকিস্তান সে প্রস্তাব নাগালের বাইরে ছুড়ে ফেলেছে।"

ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শব্দাবলীর মতই চমৎকার ছিলেন। পাকিস্তানের পরাজয়ে সেখানকার শাসনযন্ত্র-দখলকারীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। জুলফিকার আলী ভুট্টো বেসামরিক প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এক সময় ভারতের প্রতি ভুট্টোর কঠিন মনোভাব ছিল, কিন্তু তাঁর দেশের সামরিক-বাহিনীর ভগ্নদশা তাঁকে নমিত করে। তিনি সুসম্পর্কের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তারই ফসল হচ্ছে ১৯৭২-এর জুন মাসে তার এবং ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে সিমলা শীর্ষ সম্মেলন এবং জুলাই-এর তিন তারিখে তাদের যৌথ ঘোষণা। সেটা সংক্ষিপ্ত এবং খানিকটা অস্পষ্ট ছিল, যেটা পরে আবার ঘোষণা দিয়ে কাশ্মীর বিষয়ে পাকিস্তান এবং ভারতের অবস্থানকে স্পষ্ট করা হয়। তাঁরা একমত হন যে সমস্যাগুলোর সমাধান শান্তিপূর্ণ উপায়ে হতে হবে। ভারতীয় উপলব্ধি ছিল এ রকম যে ভবিষ্যতেও বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে দ্বৈত-সম্পর্কের কাঠামোর ভেতর সীমাবদ্ধ থাকবে। এরপর থেকে জাতিসংঘেও কোন আলোচনার প্রয়োজন হবে না, বিশ্বের অন্য শক্তিগুলোও কোন রকম হস্তক্ষেপ করবে না। পরবর্তীকালে ভুট্টো এ ধারনার বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাঁর এ আপত্তির পেছনের কারণ সম্ভবতঃ আরও অর্থপূর্ণ। যাহোক এই সময়টার সব চেয়ে ভালো বর্ণনা দেয়া যায় এ ভাবে যে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখন সব চেয়ে সুস্থির সময়।

www.pathagar.com

ভারতের আওতাধীনে যে ৯০,০০০ পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ-বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, ভুট্টো তা' মেনে নেননি, কিন্তু তাদের নিরবচ্ছিন্ন কারাবরণের বিষয়টি বিশ্ব-জনমতের বিরোধী ছিল এবং এর জন্য কোন ক্ষতিপূরণের সুবিধাও পাওয়া গেল না। সুতরাং ১৯৭৩-এর জুলাই মাসে বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি প্রত্যাবসন চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানীরা মুক্তি পেল। আরও এক বছর পরে লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ভূট্টো শেখ মুজিবকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের অনুমোদনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দিলেন।

সিমলা শীর্ষ-সম্মেলনে ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের চূড়ায়। কিন্তু যুদ্ধের বিপুল খরচ এবং শরণার্থীদের ভার তাদের পাওনা বুঝে নিচ্ছিল। তারা এক সাথে জাতীয় অর্থ দপ্তরের শত কোটি ডলারেরও বেশী অর্থ শুষে নিল। দুর্ভাগ্যও পিছু ছাড়ছিল না। ১৯৭২-এ কৃষিখাতে বিপর্যয় ঘটল। বিপুল শস্য-ঘাটতি দেশটাকে ক্ষুধার রাজ্যে এবং অনিবার্য সামাজিক বিক্ষোভের দিকে ঠেলে দিল। মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে চলল এবং দেশে তেলের চাহিদা তীব্র ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তৈল-উৎপাদনকারী দেশগুলো তেলের দাম বাড়িয়ে দিল।

প্রবল গণ-বিক্ষোভ এবং পুলিশের গুলিবর্ষনের ফলে আহমেদাবাদে সৃষ্ট প্রচণ্ড সহিংসতার কারণে গুরুতর রাজনৈতিক সঙ্কটের উদ্ভব হল। ফলশ্রুতিতে গুজরাট রাজ্য সরকারের পতন হল। গুজরাটের অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে। ১৯৭৩ থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তায় যে ধ্বস নামা শুরু হয়েছিল, ১৯৭৪-এ এসেও তা দ্রুততর হলো।

প্রাক্তন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ জয়প্রকাশ নারায়ন, জে.পি নামে যিনি বহুল পরিচিত, হঠাৎ করে এই অসন্তোষের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্যে জনসমক্ষে হাজির হলেন। নারায়ন তাঁর তরুণ বয়সে রাজনৈতিক কলহ সৃষ্টিতে দক্ষ ছিলেন। তাঁকে ভারতের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ এবং জওহরলাল নেহেরুও তাঁর উত্তরাধিকার ভাবতেন। কিন্তু জে.পি সব সময়ই ক্ষমতা এবং দায়িত্ব নিতে কুণ্ঠিত ছিলেন।

নেহেরু তাঁর এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এ ভাবে যে নারায়ন ছিলেন "বার বার বিপথে যেতে দক্ষ এবং দায়িত্বহীন আচরণের দোষে দোষী। কিন্তু আমার জানা ব্যতিক্রম এবং চমৎকার মানুষের মধ্যে সে একজন। এবং বৈশিষ্ট্য বিচার করলেও তাকে উচ্চ মূল্য দিতে হয়। আমার

www.pathagar.com

কাছে খুবই কষ্টকর মনে হয় যে তাঁর মত একজন মানুষের প্রবল ভাবে এগিয়ে যাওয়ার কথা, অথচ অবস্থা এ রকম যে সে যাচ্ছে শূন্যতার দিকে।"

তার একটা কারণ এই হতে পারে যে জে.পি ছিলেন একজন অবিবেচক মানুষ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫০-এ প্রতিবেশী দেশ নেপালে যখন রানা স্বৈরশাসন গণতান্ত্রিক নেপাল কংগ্রেসের সাথে সংঘর্ষে মুখোমুখি হল, আর তৎপরবর্তী নেতা বি.পি.কৈরালা যখন ভারতে উড়ে এলেন সামরিক সাহায্যের আবেদন নিয়ে, নারায়ন তখন সাংঘাতিক ভাবে সমর্থন দিলেন, এবং নেহেরুর পক্ষে তা না করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

নেহেরু মৃদু ভৎর্সনার সাথে তাঁকে এই জবাব দিলেন, "আমি তোমার বোধশক্তির অভাব দেখে মর্মাহত হয়েছি, যা তুমি দেখিয়েছ.....কোন কিছুই বিপ্লবকে স্তব্ধ করতে পারে না সেই সব মানুষের বোকামি ছাড়া যারা তার চেষ্টা করে......বাইরে আমাদের প্রতিপক্ষরা ভীষণভাবে রটাবে যে ভারতীয় আগ্রাসনের এটা একটি নমুনা এবং এই সব কিছুই আমাদের কৌশল। এটা অবশ্যই সমগ্র আন্দোলনের জন্যে ভয়ানক ক্ষতির কারণ হবে। আমাদের বিরুদ্ধে বাইরের যে শক্তিগুলো কাজ করছে, আমরা তাদের অগ্রাহ্য করতে পারি না। কৈরালা যা চাইছে তা হল একটি দেশজ-আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে, এবং যা' হবে ভারত সরকারের জন্যে স্রেফ একটা বিপজ্জনক অভিযান।

"এখানেই আমার ভয়। রাজনীতি এবং যুদ্ধ বিগ্রহে বিপজ্জনক কৌশল কদাচিৎ সফল হয়। দুঃসাহস সফল হতে পারে এবং কখনো কখনো ঝুকিও নিতে হতে পারে, কিন্তু বিপজ্জনক কর্ম শিশুর পক্ষেই স্বাভাবিক।"

নারায়নের অনেক পশ্চিমা ভক্তরা এ কথা জেনে আশ্চর্য হতে পারেন যে কমনওয়েলথে ভারতীয় সদস্য-পদ প্রাপ্তির বিষয়ে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন।

পরিণামে ১৯৫০-এ তিনি রাজনৈতিক মঞ্চের অন্তরালে চলে গেলেন, যোগ দিলেন আচার্য্য বিনোজ ভাবে'র ভূমি-সংস্কার আন্দোলনে। আচার্য্যের সাহচর্য্য পাবার পর জয়প্রকাশ ঘোষণা দেন যে তিনি সর্বতোভাবে রাজনীতি ত্যাগ করছেন এবং পাটনা ফিরে গেলেন।

যাহোক, ১৯৭৩-এ মধ্য ভারতে চম্বল উপত্যকায় তিনি চমৎকার একটি প্রচারণা অভিযাত্রা চালাতে সক্ষম হলেন। সাংঘাতিক ডাকাতদের একটা অংশ তাঁকে অনুরোধ করেছিল তাদের আত্মসমর্পনের বিষয়ে সরকারের সাথে মধ্যস্থতা করতে এবং তাদের জীবন বাঁচাতে। বিনিময়ে তারা প্রতিজ্ঞা করে যে তারা অস্ত্র সমর্পণ করবে এবং শান্তিময় জীবন যাপন করবে। জে.পি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ফলশ্রুতিতে অস্ত্র-শস্ত্রসহ ৪০০ ডাকাত পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

www.pathagar.com

বিষয়টি আবারও তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দেয়। শীঘ্রই তিনি প্রত্যেক এম.পি.দের কাছে স্বতন্ত্র অধিকার এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। তিনি 'গণতন্ত্রের জন্য জনতা' নামে দল গড়তে উদ্যোগী হন এবং ঐ বছরের জুনের শেষ নাগাদ কোন রকম সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা ছাড়াই "পূর্ণ বিপ্লব" মতবাদের ঘোষণা দেন। তাতে ছিল শুধু সরকার-বিরোধিতা।

যাই হোক, সেটা ইন্দিরা গান্ধীর জন্য মারাত্মক সমস্যা ছিল না। তাঁর সরকার গ্রামে শহরে প্রচণ্ডভাবে নক্সাল আন্দোলনের মুখোমুখি হয়েছিল। উত্তর বাংলার সুবিধাবঞ্চিত-জেলা নক্সালবাড়ি থেকে নক্সালীরা নামটি গ্রহণ করেছিল। তারা চেয়ারম্যান মাও এবং চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এবং "সংশোধনবাদী"র মত প্রচলিত দু'টি কমুনিষ্ট পার্টিকে অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা চীনা বৈদেশিক নীতিরও অন্ধ সমর্থক ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের সাথে মস্কোর সম্পর্ককে নিন্দা করত। চীনা নেতৃত্ব গ্রহণ করার ফলে তারা পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধের বিরোধিতা করে। খুবই আশ্চর্য্য যে তারা জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং তার কুচক্রীদের সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

নক্সালীরা কেবল শক্তি দ্বারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করায় বিশ্বাসী ছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে তারা বাতিল করেছিল এই বলে যে তারা বিপ্লবী নয়, সুতরাং অগ্রহণযোগ্য। তাদের আন্দালন মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিম বাংলা, অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার এবং পাঞ্জাবের একটি কি দু'টি জেলায়।

এই আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল প্রকৃত চাষীদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করা। সাথে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও যুক্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ল এবং বড় রকমের শিক্ষিত বেকার তরুণরা এতে আকৃষ্ট হল। বদলে গেল পার্টির চরিত্র। ক্রমান্বয়ে সন্ত্রাসবাদে নির্ভরতা বেড়ে চলল এবং চেয়ারম্যান মাও আর পিকিং-এ তাঁর সহকর্মীদের প্রতি অন্ধ ভক্তিশীলতায় আপাদমস্তক নিমজ্জিত হল। নক্সাল নেতা চারু মজুমদার সম্ভবতঃ পল পট (Pol Pot) ধরনের চিত্তবিকারগ্রস্থ ছিলেন। ভারতের ভাগ্য ভাল যে গণহত্যার অপরাধ করবার সুযোগ তাকে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে পল্ পটের নেতৃত্বে সংঘটিত কম্পুচিয়ার পৈশাচিক ঘটনা বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি অর্জন করে।

ইন্দিরা গান্ধী গভীর অর্ন্তদৃষ্টির সাথে নক্সালীদের আন্দোলনকে জরীপ করলেন। ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব তাঁকে যথেষ্ট দুর্বল করেছিল। কিন্তু ১৯৬০-এর

www.pathagar.com

শেষে এবং ৭০-এর শুরুতে যখন তা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে, এমনকি তখনও তাঁর সরকারের জন্যে তা সুদৃঢ় হুমকি ছিল না। তৎসত্ত্বেও অন্য এক অস্থিরতা ধীরে ধীরে ভারতকে গ্রাস করছিল। ইন্দিরা গান্ধীর অসাধারণ স্নায়ুর জোর আর শক্তি পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কটে শুভ উদ্দেশ্যে প্রকাশ পেল, যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে একা। সেখানে অস্পষ্টতার জড়তা ছিল। সঙ্কট তাঁকে ঘিরে ফেলে সৃষ্টি করেছিল এক অসহায় পরিবেশের।

১৯৭৪-এ সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সারা দেশের ওপর ঋতুভিত্তিক নিম্নচাপের মত চেপে রইল। বিহার সম্ভবতঃ ভারতের সব চেয়ে পশ্চাৎপদ রাজ্য। ঝড়ের প্রথম কেন্দ্র ছিল এটি। পাটনায় ছিল প্রবল ছাত্র-বিক্ষোভের দৃশ্যপট। যা শেষ হয় সহিংস পন্থায়। বিক্ষোভকারীরা পুলিশ ব্যারিকেড-এর ওপর বেপরোয়া ভাবে চড়াও হতে উদ্যত হলে লাঠি-চার্জ এবং টিয়ার-গ্যাস নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে হয়। পরবর্তী ১৮ মার্চ থেকে বোঝা গেল যে ধ্বংসকারী শক্তি ছিল স্পষ্টভাবে বাইরের। বেশ কিছু সাধারণ ঘরবাড়ি, দোকান এবং দু'টি সংবাদপত্রের অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়া হল। এক সপ্তাহের ভেতর তার ধারাবাহিকতায় রেস্তরাঁ, হোটেল এবং বাণিজ্যিক ভবনগুলোতে লুটতরাজ এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালান হল। এই নৈরাজ্যমূলক কর্মকান্ড দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল ছোট ছোট নাগরিক কেন্দ্রগুলোতে। ফলে পুলিশকে কঠিন ভাবে মোকাবেলায় নামতে বাধ্য হতে হয় এবং বিরোধীরা যথারীতি পুলিশি বর্বরতার সমালোচনা করে।

জয়প্রকাশ নারায়ন সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে বিবেকী কণ্ঠস্বর হিসেবে ব্যাপক ভাবে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর ক্ষমতা ছিল উচ্ছৃঙ্খল জনতার সহিংসতাকে বন্ধ করার, কিন্তু তিনি তা করলেন না। পরিবর্তে তাঁর একজন অনুসারী খোড়া-যুক্তি দেখিয়ে বিবৃতি দিলেন যে শাসকগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সহিংসতার মধ্যের পার্থক্যকে চিনতে শেখা উচিত। এক ধরনের সহিংসতা যা জনসাধারণের এবং বেসরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করে, এবং "ছোট ধরনের সহিংসতা যেমন ইট-পাটকেল ছোড়া অথবা টায়ার জ্বালিয়ে যানবাহনের বাধা সৃষ্টি করা অথবা পাল্টা কোন আক্রমণ....." এই রকমের ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি হয়ে কোনো জায়গার কোনো সরকারই এই ধরনের পৃথকীকরণকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

আইনসভা অবরোধ করা হল এবং আত্মঘোষিত শান্তিবাদী এবং গান্ধীবাদী জয় প্রকাশ নারায়ন ঘোষণা করলেন, "বন্ধুরা, এই হচ্ছে বিপ্লব, একটি সম্পূর্ণ বিপ্লব। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। বহু দূর....." সম্ভবতঃ তত দূর যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় সরকারের পতন হয়।

www.pathagar.com

১৯৭৪-এর নভেম্বর মাসে জয়প্রকাশ দিল্লীতে গেলেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিহার আইনসভা ভেঙ্গে দেবার দাবি করলেন। প্রধান মন্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পরামর্শ দিলেন যে ব্যালট-বাক্সই এ ধরনের সমস্যার সঠিক সমাধান। ফলে মন্ত্রীবর্গ এবং আইন সভার সদস্যদের অবিরত নাকাল করার মধ্য দিয়ে বিহারে অদম্য ভাবে প্রচারাভিযান চলতে লাগল। সেখানে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবার কোন বিরতি ছিল না। জয়প্রকাশ গোটা দেশের জনগণকে বক্তৃতা দিয়ে জাগাবার জন্য তুর্কি-নাচন শুরু করলেন। দিল্লীর 'বোট ক্লাব'-এ সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ এবং সরকারী কর্মচারীদের কাছে সরকারকে অমান্য করবার জন্য তিনি আহ্বান জানালেন, যা ছিল বিদ্রোহে উস্কানি দেবার সামিল।

জয় প্রকাশ নারায়নের কর্মকান্ড গভীরভাবে সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষন করল। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র ইন্দিরা গান্ধীর বিপক্ষে অবস্থান নিল। কিছু কিছু উপ-নির্বাচনে জনতা ফ্রন্ট নামে একটি বিচিত্র গ্রুপের কাছে সরকারী দল পরাজিত হলে আবারও উত্তেজনার আগুনে ঘৃতাহুতি হল।

যাহোক, ১৯৭৪-এ এটা ছিল শিল্পসংক্রান্ত শ্রমের একটা প্রেক্ষিত, যা সরকারের আরো উদ্বিগ্নতার কারণ হল। বিশেষ করে ১৯৭৪-এর মে মাসে জর্জ ফার্নান্দেজের নেতৃত্বে রেল-ধর্মঘট। ভারতের আর্থিক কাঠামো এবং যাতায়াত ব্যবস্থাকে যা ভেঙ্গে চুরে স্তব্ধ করে দিল। বৃটিশের তৈরি রেলপথ এই উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়ানো। জিনিসপত্র আনানেয়া, লোকজনের চলাচলের সব চেয়ে বড় মাধ্যম। সেটা যদি ঠিকমত কাজ করতে না পারে, তা'হলে জাতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা নিশ্চল হতে বাধ্য।

এই রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বাহ্যিক জড়িমা ছুড়ে ফেলে ভয়ঙ্করভাবে ধর্মঘটীদের প্রতি ঘুরে দাড়ালেন। ভারত রক্ষা আইনকে কাজে লাগিয়ে এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন অনুসারে তিনি ব্যাপক বরখাস্তের এবং গ্রেফতারী পরওয়ানা ছাড়াই প্রচুর গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। তিন সপ্তাহের ধর্মঘট মে'র ২৮ তারিখে চূড়ান্ত ভাবে গুটিয়ে গেল। কিন্তু তার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল সাংঘাতিক। প্রায় ৫০০ কোটি অথবা ৬৬ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার ক্ষতি হল। দরিদ্র দেশটার জন্যে তা উচ্চ মূল্যের জটিল জালে জড়িয়ে পড়বার কারণ হল। বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্য থেকে তেল আমদানী, কৃষি খাতে মন্দা এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রা স্ফীতি। এ আঘাত খুব কঠিন ছিল।

www.pathagar.com

১৯৭৪ সনকে যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে ১৯৭৫-এও সে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার কোন লক্ষণ ছিল না। মার্চ মাসে কংগ্রেস-এর অন্যতম 'তরুণ তুর্কী' মোহন দারিয়া, 'ওয়ার্কস এ্যান্ড হাউজিং' মন্ত্রী এবং ইন্দিরা গান্ধীর একজন একান্ত গুণগ্রাহী, অভিমত জানালেন যে ইন্দিরা গান্ধীকে অবিলম্বে বিরোধী পক্ষের সাথে কথা বলা উচিত। তরুণ ধর্মঘটীদের সাথে বর্বর আচরণ করবার জন্যেও তিনি পুলিশকে অভিযুক্ত করলেন। কিন্তু তার অভিমত কোথাও আমল পেল না। প্রধান মন্ত্রী ঠান্ডাগলায় তাকে জানিয়ে দিলেন যে কংগ্রেসের মতামতের সাথে যদি তার মত না মেলে তবে তার পদত্যাগ করা উচিত। অবিলম্বে তিনি পদত্যাগ করলেন এবং বিরোধী দলে যোগদানের ফলে তার জনপ্রিয়তা প্রবল ভাবে বেড়ে গেল।

সরকারের চারপাশে ছড়ানো জালটি আরও শক্ত ভাবে এটে বসল যখন জয়প্রকাশ নারায়ন যুগপৎ দিল্লীতে বিশাল মিছিলের আয়োজন করলেন। মোরারজি দেশাইও তখন কেন্দ্রীয় মঞ্চে ফিরে এসেছেন। সেই সাথে তিনি ১৯৭৪-এর মার্চের প্রবল বিক্ষোভের সময় জারীকৃত প্রেসিডেন্ট আইন তুলে নিয়ে গুজরাট সংসদের জন্য নতুন নির্বাচন না দেয়া পর্যন্ত আমৃত্যু অনশনের হুমকি দিলেন। অবশেষে নতুন দিল্লী থেকে জুন মাসের প্রথম দিকে নির্বাচন দেয়া হবে মর্মে ঘোষণা দেয়া হল। মে মাসের শেষাশেষি, মৌসুমী বায়ু প্রবাহ শুরু হবার আগেই রাজনৈতিক ঝোড়ো মেঘ আরও ঘনীভূত হল যখন জয়প্রকাশ নারায়ন 'জনতা সরকার' গঠনের ঘোষণা দিলেন; বলা হল যে চলমান প্রশাসনের সমান্তরালে গ্রাম-পর্যায়েও সব কাজকর্ম চলবে। সম্ভবতঃ তা ছিল তার 'পূর্ণ বিপ্লব'। জয়প্রকাশের প্রেরণা ছিল চীনের চেয়ারম্যান মাও'র সাংস্কৃতিক বিপ্লব। কিন্তু সুখের বিষয় হচ্ছে, ভারতের ভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবেশে কোথাও তেমন নিষ্ঠুর অথবা ধ্বংসাত্মক অবস্থা ছিল না। ১৯৬৯-এ কংগ্রেস ভাঙ্গার প্রসঙ্গ টেনে ইন্দিরা গান্ধীর দলত্যাগীদের নিয়ে দল গঠনের উদ্যোগকে তিনি তীব্র ভাবে নিন্দা করে বলেন যে ইন্দিরা গান্ধী বিতাড়িতদের পশ্চাৎভাগের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি নিজেই এ ধরনের সমালোচনার যোগ্য পাত্র হন যখন তাঁর কাছে আশ্রয় প্রাপ্তদের কারণে 'জনতা সরকার'-এর কাজকর্ম জবড়জং মিউজিক্যাল চেয়ারে পরিণত হয়। আরও বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় ছিল পাকিস্তানে আইয়ুব খানের 'বেসিক ডেমোক্রেসী'-কে তাঁর সম্মানপূর্ণ সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি, যা ছিল মিলিটারী একনায়কতন্ত্রের একটি ধুম্রজাল।

মার্চের ১৮ তারিখে ইন্দিরা গান্ধী একটি মামলায় ৫ ঘন্টা প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৭১-এর জাতীয়

www.pathagar.com

নির্বাচনে অসততার অভিযোগ আনেন রাজ নারায়ন। সে সময় তিনি রায় বেরিলী নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে ভাঁড় হিসেবে বিবেচিত রাজ নারায়নের ঝোঁক ছিল তার নির্বাচনে পরাজয়ের রশিটি কোর্টে প্রসারিত করে বছরের পর বছর পার করা। প্রাথমিক ভাবে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে পেশ করা এই মামলা খুব সামান্যই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু কৌতুহল বেড়ে গেল এবং একটা গুপ্ত প্রত্যাশা তৈরী হল যখন ১৯৭৫-এর ১২ জুন তারিখে বিচারপতি জে. এল. সিনহা রায় প্রদান করলেন। নারায়ন আনীত ১৪-টি অভিযোগের মধ্যে ১২-টিই তিনি খারিজ করে দিলেন, কিন্তু বাকি দু'টিতে তিনি প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। তিনি বললেন, জশপাল কাপুরকে ব্যবহার করে ইন্দিরা গান্ধী আইনকে লঙ্ঘন করেছেন। সরকারী কর্মকর্তা কাপুর প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭১-এর ১৩ জানুয়ারী তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তার স্বীকৃতি প্রদান করা হয় ২৫ জানুয়ারী। কাপুর ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে ৭ জানুয়ারী থেকে কাজ করছিলেন। সুতরাং ২৫ তারিখ তার কাজ অবৈধ ছিল।

ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগটি ছিল কিছু সরকারী কর্মকর্তাদের কাজে লাগানোর বিষয়ে। এদের মধ্যে ছিলেন প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সুপারইন্টেনডেন্ট, পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এবং যে মঞ্চ থেকে মিসেস গান্ধী ভাষণ দেন তা আলোকিত করার কাজে নিয়োজিত হাইড্রোইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। এগুলো ছিল স্রেফ কলা-কৌশলগত খুটিনাটি। কিন্তু এই কারণে ১৯৭১-এ অনুষ্ঠিত বেরিলী কেন্দ্রের নির্বাচন বিচারপতি সিনহা বাতিল ঘোষণা করলেন। তা ছাড়া পরবর্তী ৬ বছরের জন্যে তাঁকে লোকসভা অথবা কোনো রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। বিচারক স্পষ্টতঃ কখনো শাস্তি এবং যথাযথ অপরাধের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। অথবা তিনি চাইলে, এটা অগ্রাহ্যও করতে পারতেন। কেমন করে একজন অভিজ্ঞ এবং বিচার বিভাগীয় উর্ধ্বতন সদস্য এ রকম উদ্ভট রায় দিতে পারেন, তা অবশ্যই ভবিষ্যৎ তদন্তের জন্যে তোলা রইল। কিন্তু এটা খুবই কৌতুহল উদ্দীপক বিষয় যে যদি পুলিশ বা রাষ্ট্রীয় অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব না নেয়, তাঁর মতে এ দায়িত্ব তাহলে কার? প্রকৃতপক্ষে কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী অথবা ফরাসী এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়?

www.pathagar.com

২০ দিন মুলতবি আদেশ ছিল রায়ের একমাত্র যৌক্তিক দিক। যাতে বলা হয়েছিল, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি এই সময়ের ভেতর একজন নতুন নেতা নির্বাচন করবেন যাতে দেশ নেতৃত্ববিহীন না থাকে।

একই দিনে গুজরাট রাজ্যের নির্বাচনে সরকারী দল কংগ্রেস গুরুতরভাবে পরাজিত হয়। ১৮২-টি আসনের মধ্যে মাত্র ১২-টি আসন পেল তারা। জনতা ফ্রন্ট এই নির্বাচনে স্মরণযোগ্য বিজয় অর্জন করল। রাজনৈতিক এই পরিবর্তিত অবস্থা এবং অস্থিরতা, এই দুয়ে মিলে তুষারধ্বসের মত দুর্যোগ বজ্রনির্ঘোষে প্রধান মন্ত্রীর ওপর নেমে এলো। ইন্দিরা গান্ধীর সর্বনাশ নিশ্চিত জেনে জুনের ১৬ তারিখে ১৫জন বিরোধী দলীয় নেতা প্রেসিডেন্ট ফখরুদ্দীন আলী আহমেদকে অনুরোধ করলেন তাঁকে "এই মুহূর্তে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় ছেড়ে দিতে" নির্দেশ দেওয়ার জন্য। মিঃ জাস্টিস সিনহা'র ২০ দিন মুলতবি আদেশ এবং আসন্ন বিজয়ের প্রেক্ষিতে তারা অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলেন। অন্যপক্ষে ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রীরা তাঁর প্রতি দ্রুত আনুগত্য প্রকাশ করলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সেই ঝড়ের মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তাঁর অন্তরঙ্গ উপদেষ্টামণ্ডলীর বিভিন্ন উপদেশের মুখোমুখি হয়েও ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্টভাবে জানতেন, তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। তিনি সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলেন। যার ফলে জুন ২৪, ১৯৭৫ তারিখে এলাহাবাদ হাই কোর্টের রায় সাময়িকভাবে খারিজ হয়ে গেল। ইন্দিরা গান্ধী জানতেন যে তাঁর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ না সুপ্রীম কোর্টের নিয়মিত বেঞ্চে পূর্ণ শুনানী হয়। সেটি সম্ভব হল নভেম্বর ৯, ১৯৭৫ তারিখে যখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশ উল্টে যায়।

কিন্তু তখন বিরোধী এবং প্রধান দলগুলো বিশাল জনসমাবেশ এবং শোভাযাত্রা করে তাদের পেশীর জোর প্রদর্শন করছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ন দেশের সর্বত্র থেকে জনসমাগম করে দিল্লীর উদ্দেশ্যে মার্চ করবেন বলে হুমকী দিলেন। জুন ২৫, ১৯৭৫'র রাতে যে ক্ষমতা দৈনিক পত্রিকাগুলোর ছাপাখানা চালু রেখেছিল, অকস্মাৎ তা' স্তব্ধ হয়ে গেল এবং দেশে জরুরী আইন বলবৎ হল। পরদিন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে ব্যাখ্যা করলেন যে এই চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন প্রচণ্ড অব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা যাতে দেশে ছড়িয়ে না পড়ে সেটা বন্ধ করতে। কেউ কখনো এ চ্যালেঞ্জ এড়াতে পারে না। তিনি দৃশ্যতঃ হালছাড়া অবস্থার অবসান ঘটালেন এবং দ্রুত চূড়ান্ত আঘাত হেনে নিষ্ক্রিয় করে দিলেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

জরুরী অবস্থা এবং পতন

ইন্দিরা গান্ধীর কর্মজীবনে নিঃসন্দেহে জরুরী অবস্থা ছিল সব চেয়ে বিতর্কিত অধ্যায়। দেশের মধ্যে বিষয়টি তাঁর এবং বুদ্ধিজীবী একটি অংশের মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি করেছিল; বিদেশে পশ্চিমাদের কাছে বিষয়টা অস্ত্রের মত ব্যবহার্য্য ছিল; তারা জওহর লাল নেহেরু পরিকল্পিত জোট-নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। এর ফলে নয়া দিল্লীকে বিষয়টি প্রথমে বিস্তৃত বর্ণনা করতে হয়েছে, পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইষ্টার্ণ ব্লকের সাথে স্বাধীন এবং সমন্বিত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছে। লন্ডনের 'ডেইলি এক্সপ্রেস'-এ কঠিন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে পশ্চিমা প্রভাবশালীরা কী ভাবছে। তারা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের সাথে স্পষ্ট করে তা জানিয়েছে। তাঁকে হত্যার পর সকালের পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "এটা ভন্ডামি হবে যদি বলা হয় যে ইন্দিরা গান্ধী আমাদের গভীর ভালবাসার মূর্ত প্রকাশ ছিলেন। বৃটেনের অনেকের মত আমরাও তাঁর দাসসুলভ সোভিয়েত নীতি অবলম্বন-কে নিন্দা করি। সেটা গণতন্ত্র বা কমনওয়েলথ নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত ছিল না।"

একজন ভারতীয় সাংবাদিক ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী আইনকে উগান্ডার ইদি আমিনের পন্থার অনুরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। দেশের এক বা দুজন সুপরিচিত বিরোধী তাঁকে হিটলার এবং স্টালিন বলে অভিহিত করেছেন। এই ধরনের অতিরঞ্জন গভীর ভাবে চিন্তা করার অক্ষমতাকে প্রকাশ করে। সহজ একটা নৈতিক পলায়নপরতার পথকেও সহজ করে। কারণ কোন রাজনৈতিক অথবা সামাজিক ব্যবস্থায় প্রতিটি ভুল অথবা অক্ষমতা যদি সুবিধা মত কোন নিঃসঙ্গ মানুষের অনৈতিকতা বলে প্রমাণ করা যায়, তখন অন্যান্য অংশীদাররা সে ব্যর্থতার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।

ভারতের রাজনৈতিক গঠনতন্ত্র 'ওয়েষ্টমিনিষ্টর' মডেলের। যার আধুনিকায়নের ছাপ পাওয়া যেতে পারে সম্ভবত ১৮৩২-এর 'রিফর্ম বিল'-এ। সেই বিল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পঙ্কিলতা শোধন করে চলমান সতেজ

www.pathagar.com

বুদ্ধিমন্তদের দ্বারা শক্তি অর্জন করা এবং ধর্মাশ্রয়ী ও ধর্মনিরপেক্ষ মৌলিক আন্দোলনসমূহ, যা থেকে ট্রেড ইউনিয়নের উৎপত্তি এবং যা শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধন মুক্তির নেতৃত্ব দেবে, এই জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সামাজিক ভিত্তিতে উদার এবং একই সাথে শক্ত করার লক্ষ্যে বৃটিশ রাজনীতির গঠনতন্ত্র অনুমোদন করে। এর সাথে যুক্ত আছেন আত্মবিশ্বাসী এবং দক্ষ শাসকশ্রেণী, যারা সরকারে ঐতিহাসিকভাবে অভিজ্ঞ, অলিখিত রাজনৈতিক বিধি বিধান এবং তার অনুশীলন প্রকাশের অনুমতিপ্রাপ্ত এবং এ সব বিষয় পরিপালনের দ্বারা গঠনতন্ত্রকে টেকসই রাখতে তারা বিপুলভাবে সহযোগিতা করেন। কার্যতঃ রাজনীতির আত্মনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের বন্দোবস্ত নির্ভরযোগ্য হয় সংসদে এবং সংসদের বাইরে ট্রেজারী এবং বিরোধীদলের আত্ম-নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে। স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার অপব্যবহারের মধ্যকার লাইনগুলি পরিষ্কারভাবে মিলে গিয়েছিল।

এমন কোন বাধ্যবাধকতা জয়প্রকাশ নারায়ন আর তাঁর বন্ধুদের প্রভাবিত করেনি যার ফলে তাদের পূর্ণ বিপ্লব বা পূর্ণ বিশৃঙ্খলা, যেমনটি দেখা গেছে, বর্তমান শিল্পনির্ভর গণতন্ত্রে তাদের কাটখোট্টা রকমের আচরণের চর্চা, সেটা করতে হয়েছে। জেপি'র পরিবর্তন আনার আহ্বানের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থনীতির, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক কর্মসূচির অভাব ছিল। এবং প্রশংসা ছিল বিশ্বব্যাপী সেই সব বাস্তবতার যা ভারতকে বিপদগ্রস্ত করে। এটা ছিল এমন একটা ব্যাপার যেখানে জাতীয় স্বার্থের কথা কখনো উচ্চারিত হয়নি।

জে.পি'র আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ১৯২০, ৩০ এবং ৪০-এর দশকে মহাত্মা গান্ধীর গণসংগঠন এবং ব্যাপক প্রচার ছিল ভারতে বিদেশী ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধে জয়ের লক্ষ্যে। সুতরাং সেখানে কিছু কিছু বল প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছিল। উদাহরণস্বরূপ, সরকারী সম্পত্তি রক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। মহাত্মাজী তাঁর অনুসারীদের শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে কঠিন নির্দেশ দান এবং ব্যক্তিগত উদ্দীপনা সঞ্চার করতেন। তবু তারা সব ক্ষেত্রে সহিংসতা থেকে দূরে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। আইন অমান্য করার এই ঐতিহ্য ভারত স্বাধীন হবার পরও অব্যাহত রয়েছে। একটি স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক প্রয়োজনেই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোন প্রচেষ্টা কোথাও নেই। সব চেয়ে কম সচেষ্ট গান্ধীবাদী বলে আত্মঘোষিত দলটি। যেটাকে বলা হয় ভারতের হিন্দী হৃদয়ভূমি, যে কোন ইস্যুতে অধিকাংশ সমর্থন জে.পি. যেখান থেকে পেয়েছেন, পবিত্র গো-পূজা থেকে শুরু করে নগ্ন সাধু অথবা পবিত্র মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত, যে

www.pathagar.com

কোন গণ আন্দোলনই ছিল তাঁর নির্দোষ খেলা। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সংশোধিত বুদ্ধির বিকাশ এবং সামাজিক প্রবাহ বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণের ওপর লক্ষ্যনীয় প্রভাব ফেলেছিল; উত্তরে পড়েছিল কম, সেটা সেখানকার রাজনীতির পশ্চাৎপদতার প্রমাণ।

এই আন্দোলনের ফলাফল ছিল এই যে, যদিও এক সাথে লেগে থাকার মানসিকতা এবং সঙ্গতিপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অভাব, তবুও তা দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর স্থিতিশীলতার জন্য কঠিন হুমকী হয়ে দাঁড়ায়।

জরুরী অবস্থা শুরু হয় জয় প্রকাশ নারায়ন এবং মোরারজী দেশাইসহ অধিকাংশ বিরোধী নেতাদের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধী কবি ডম্ মোরাস্ (Dom Moraes)-কে বলেন যে, "প্রধান বিরোধী নেতাদের মধ্য খুব কম সংখ্যক ছিলেন যাদের আমি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করতে পারি। বাকিদের গ্রেফতার-এর বিষয়টি রাজ্য সরকার এবং পুলিশের বিচক্ষণতার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। যে কাউকে গ্রেফতারের বিষয়ে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল তা হল দেশের মধ্যে অথবা বিভিন্ন এলাকায় যারা অস্থিরতা ছড়াতে পছন্দ করে তাদের বিরুদ্ধে। এত সব বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমরা এত বেশী সময় ব্যয় করেছিলাম যে দেশের জন্য কাজ করবার সময় আমাদের ছিল না। যদি আমরা নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেতাম, আমরা কাজ করতে পারতাম। জরুরী অবস্থার একান্ত প্রয়োজন ছিল।"

সেটা একটা পর্য্যায় পর্যন্ত সত্যি ছিল। ভারতীয়দের একটা অংশ যারা সরকারের পরিচালন দক্ষতায় গভীর ভাবে হতাশাগ্রস্থ ছিল, যথাযথ আইন শৃঙ্খলা তাদের মনে করিয়ে দেয় যে দেশে শাসনব্যবস্থা চালু আছে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে পরিস্থিতি অনুযায়ী তা কার্যকর হতে পারে। কঠিন নিয়ন্ত্রণ অর্থ হচ্ছে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যা আকাশ ছোয়া ছিল, দ্রুত তা নেমে গেল। সাধারণ ক্রেতাদের স্বস্তি ফিরে এলো তাতে। বিপুল পরিমাণে চোরাকারবারী এবং কর ফাঁকিবাজদের ধরা হল। উন্নত পরিকল্পনা এবং কঠোর ভাবে আইন প্রয়োগের ফলে সম্পদ এবং জনজীবন অধিকতর নিরাপদ হল।

জাতীয় অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হল, তারপর শক্তিশালী হতে শুরু করল। শ্রম ক্ষেত্রে অধিকতর ভাল শৃঙ্খলা থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ল এবং গোটা দেশে জিনিসপত্র সরবরাহ দ্রুত হল। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ সন্তোষজনক ভাবে বৃদ্ধি পেল। যদিও তার পেছনে সব চেয়ে বেশী কাজ করেছিল মৌসুমী হাওয়া এবং সঙ্গতিপূর্ণভাবে চাষাবাদকে প্রাধান্য দিতে কুণ্ঠিত না হওয়া।

www.pathagar.com

যাহোক জরুরী অবস্থার অন্ধকার দিকটাও দ্রুতই স্পষ্ট হল। গ্রেফতারের সাথে সাথে সংবাদপত্র এবং ফিল্মে সেন্সর করা এবং ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে সঞ্জয়কে সরকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখানো শুরু হল। তার নব গঠিত ইয়থ কংগ্রেস-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল মুখোশধারী মিডিয়া; তার মুখের ছবি ছড়িয়ে থাকত খবরের কাগজগুলোর পাতায় পাতায়। তার প্রতিটি শব্দ এবং কর্মের বিস্তৃত বর্ণনা থাকত তার সাথে। তার মা'য়ের স্থির দৃষ্টি দেশের সর্বত্র জনতার মুখোমুখি হত রাস্তার বিজ্ঞাপন মঞ্চ থেকে। এ সব ঘটছিল ইন্দিরা গান্ধীর একজন পরামর্শকের মন্ত্রণা অনুয়ায়ী। তারপর সেই সময় এলো যখন একজন মোসাহেব নিলর্জ্জ ভাবে ঘোষণা করল, 'ইন্দিরাই ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়াই ইন্দিরা।" তাঁর ব্যক্তিত্বের ধরন কখনোই চীনের চেয়ারম্যান মাও, নর্থ কোরিয়ার কিম ইল সুং, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ অথবা ঘানা'র নক্রুমা'র মত সামঞ্জস্যহীন, অযৌক্তিক ছিল না। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় অনভ্যস্ত সংবেদনশীল কানে তা কট করে বাজে। কারণ এখানকার জনগণ যে যে ধরনের দায়িত্ব পালন করুক না কেন, তারা নম্র।

প্রধানমন্ত্রীর ওপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব ছিল সঞ্জয় গান্ধীর। তার কর্মজীবন শুরু হয় রোলস-রয়েস-এর শিক্ষানবীশ হিসেবে। ১৯৭০-এর নভেম্বরে তিনি প্রথম প্রচারমাধ্যমে আসেন যখন সরকার অজস্র আবেদনকারীর ভেতর থেকে জনগণের জন্য ছোট, সস্তা মোটর গাড়ি তৈরির লাইসেন্স একমাত্র তাকে দেয়। তিনি ঘোষণা করেন যে বছরে ৫০,০০০ মোটর গাড়ি তিনি প্রস্তুত করবেন। এবং 'মারুতি' ফ্যাক্টরী আদল পেল। এ ছাড়াও সঞ্জয়ের চরিত্রে কিছু কিছু গুণাবলী ছিল যাতে তিনি এই ধরনের উদারতার যোগ্য ছিলেন। তবু এই সিদ্ধান্ত ঠিকই সংসদে এবং একই সাথে প্রেস কর্তৃক সমালোচিত হল।

ইন্দিরা গান্ধীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ওপর এলাহাবাদ হাই কোর্টের রায়ে তিনি যখন প্রবল মর্মবেদনায় পীড়িত ছিলেন, তাঁর সেই একান্ত একাকী এবং জটিল সময়ে সঞ্জয় তাঁকে সমর্থন জুগিয়েছিলেন। তাঁকে অফিসে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে, পদত্যাগ না করে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। দেশে যখন জরুরী আইন শান্ত ভাবে মেনে নেয়া হচ্ছে, জুয়া খেলাও শুরু হল তার প্রাপ্য বুঝে নিতে এবং সঞ্জয়ের রাজনৈতিক ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চললো। ফলে ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হলেন ছেলের দিকে মনোযোগ দিতে। তাকে দেখালেন তাঁর দলের অপর্যাপ্ততা এবং জাতীয় নেতৃত্বদানকারী রাজনীতিকদের দুর্বল দিকগুলো। নেহেরু এবং শাস্ত্রীর মৃত্যুর সাথে সাথে রাজনীতিটা ব্যাবসায়ে পরিণত হয়। একই সাথে রুটি মাছের জন্য ক্ষুধার্ত

www.pathagar.com

মানুষের দল বেড়ে যাওয়া ছিল গভীর অস্থিরতার নিদর্শন। জাতীয় রাজনীতির শ্রেষ্ঠ সময়ে দাদাভাই নওরোজী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বি.জি. তিলক, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, এস. পি. সিনহা, সি. আর. দাস. মতিলাল নেহেরু, জে. এম. সেনগুপ্ত এবং সমমর্যাদার অন্যান্যরা ছিলেন গর্বের ধন, মহাত্মা গান্ধীর বিষয় কিছু বলবার নেই। তিনি মহাত্মাই। সে সময় রাজনীতি ছিল ভারতের বৃহত্তর নব জাগৃতির অংশ। সাথে ছিল অতীতকে নতুন করে আবিষ্কার এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন। রাজনৈতিক জীবন বহমান ছিল কর্মযজ্ঞে। ১৯৪৭-এর আগস্টে জওহর লাল নেহেরু যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন এই জোয়ার চলে গেছে, পিছে রেখে গেছে জলে-ভাসা কাঠের টুকরোর (দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) স্তূপ। এই অবস্থায় স্পষ্ট হল ভারতীয় মধ্যবিত্তের চিরাচরিত দুর্বলতা। সাথে যুক্ত ছিল দুর্বল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভিত্তি। এবং উপনিবেশিক নিশ্চলতা থেকে বিলম্বিত উত্থান।

এই অবস্থাকে উল্টে দেবার জন্যে নেহেরু তাঁর শেষ বছরগুলোতে কামরাজ-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করেছিলেন। তাতে দরকার ছিল প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষ কজন মন্ত্রীর সরকার থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেসের দলীয় কাজে নিজেদের উৎসর্গ করা। প্রতিষেধকটি চমৎকার ছিল, কিন্তু খুব দেরী হয়ে গিয়েছিল। অন্য দিকে সঞ্জয়ের সমাধান ছিল কঠিন এবং ধ্বংসাত্মক। তার চারপাশে তিনি জুটিয়েছিলেন একটি চাটুকারী উপদল এবং মহৎ আদর্শের প্রেক্ষিতে তারা ছিল অশিক্ষিত। সেই সব মাথামোটাদের সব চেয়ে বড় গুণ ছিল যে কোন ভাবে হোক দ্রুত টাকা কামানো। ইয়থ কংগ্রেস-এ স্রোতের মত এরা এসে ভিড়েছিল। বস্তিগুলোতে এরা মিথ্যে অস্থিরতা বাড়িয়েছে, জাতীয় জন্মহার কমানোর লক্ষ্যে বিপুল বন্ধ্যাকরণ প্রকল্প ভুল ভাবে পরিচালনা করা হয়েছে যা দরিদ্রদের অযথা ভোগান্তির কারণ হয়েছিল। কিছু নৈতিক সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন এসেছিলো এবং খুবই কম অথবা কিছুই ফল হয়নি।

আত্মগর্বে গর্বিত বিপুল সংখ্যক দুষিত বাণিজ্যিক সম্রাটের জন্ম হলো। মাঝারি ধরনের মারুতি কার ফ্যাক্টরী অন্য একটি শাখায় পল্লবিত হল, নাম 'মারুতি এ্যভিয়েশন কোম্পানী'। এই কোম্পানী হলো পাইপার এয়ারক্র্যাফট-এর একমাত্র প্রতিনিধি। তাদের জন্যে সঞ্জয় ১৯টি বিমান সরবরাহের অর্ডার নিশ্চিত করলেন আর কমিশন হিসেবে পকেটে পুরলেন ৯,০০,০০০ মুদ্রা।

সময়ের সাথে সাথে জরুরী আইন এক সময় অযৌক্তিক, খেয়ালী এবং কখনো কখনো নিষ্ঠুর হয়ে পড়ল। কিন্তু তৎসত্বেও একনায়কতন্ত্রের

www.pathagar.com

কৌশলগুলো দৃশ্যমান ছিল। ভারত পুলিশ রাজ্যে পরিণত হয়নি। তার জন্যে রাজনৈতিক এবং আর্থিক বিনিয়োগের পরিকল্পনার দরকার ছিল। যা ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্টতই গ্রহণ করেননি। সম্ভবতঃ তিনি তার বাবার সতর্কবাণীর শব্দাবলীকে স্মরণ করেছিলেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন, "আমাদের ভাল, মহৎ এবং ক্ষুদ্রের নানা রকম মিশ্রণ আছে। এবং অতিরিক্ত ক্ষমতা'র অন্বেষণ হচ্ছে একটা সাংঘাতিক বিষয়। দ্রুত হোক অথবা দেরীতে হোক, পতন এবং ধ্বংস কোন ব্যক্তি বা জাতির ওপর নেমে আসুক, কে তা চায়।"

জানুয়ারী, ১৮, ১৯৭৭, ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শুভ সহজাত প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পন করলেন এবং সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। তাঁর বিরোধীদের (যাদের অধিকাংশকে খুব ভালভাবে এবং স্বাচ্ছন্দের সাথে রাখা হয়েছিল) কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হল, প্রেসকেও স্বাধীনতা দেয়া হল। নিজস্ব লোকজনের ভেতর থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক অংশের সভাসদ এবং উর্দ্ধতন নিরাপত্তাকর্মীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে সুরক্ষাপ্রাপ্ত ইন্দিরা গান্ধীর জন্যে যে কী দুর্যোগ অপেক্ষা করছে সে সম্পর্কে তাঁর সামান্যই ধারনা ছিল। কিন্তু দেয়াললিখন ক্রমান্বয়েই স্পষ্ট হচ্ছিল। তাঁর সুসময়ের সহকর্মী জগজীবন রামও পুরো জরুরী অবস্থাকালীন সময়ে যিনি তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ রক্ষা করেছিলেন এবং সরকারে অংশ নিয়েছিলেন, তাকে ছেড়ে গেলেন জনগণের প্রতিকূলতা বুঝতে পেরে। এবং জয় প্রকাশ নারায়ন, যিনি এক সময় দলত্যাগী এবং বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে দল গঠনের জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে বিদ্রুপ করতেন, তাঁকে দু'বাহু বাড়িয়ে স্বাগত জানালেন।

রামের দলত্যাগ ইন্দিরা গান্ধীকে কঠিনভাবে আঘাত করেছিল। এর ফলে তাঁর ওপর জনগণের আস্থার ক্ষেত্রটিতে কষে ঝাকুনি লেগেছিল এবং তিনি হরিজনদের ভোট থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। সুবিধা বঞ্চিত হরিজন সম্প্রদায় সঙ্গত কারণেই কিসে তারা একটু ভাল থাকবে সে বিষয়ে নেতার কাছ থেকেই সঙ্কেত গ্রহণ করে। কিন্তু প্রতারণা খুব কমই বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে। রামের দলত্যাগে জনতা'র নেতারা তুরীয় আনন্দে ভেসেছেন, কারণ এতে করে তাদের ভোটে জেতার সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু যারা ব্যাকুল ভাবে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা করে এবং আশা করে যে সর্বক্ষণ তা আকড়ে থাকতে পারবে, যদি তা পারেও, তাদেরও এক সময় এই বোধোদয় হবে যে অন্যদেরও সুসময় আসতে পারে যাতে একই ভাবে তাদেরও পতন আসবে। যাহোক জগজীবন রামের সব ইচ্ছেই জনতার সাথে সম্মিলিত

www.pathagar.com

শিরোনামে প্রকাশ পেত এবং তা শুরু থেকেই প্রধান মন্ত্রীর বিপর্যয়ের কারণ হল। সুতরাং ইন্দিরা গান্ধীর জন্য সেই মার্চ হল বিশেষ মার্চ। সে মাসের ২২ তারিখের নির্বাচন দুর্দশার বার্তা বয়ে আনল। কংগ্রেস উত্তরে পরাস্ত হল, যেখানে সংসদের সব চেয়ে বেশী আসন। তিনি নিজে তাঁর রায় বেরিলি আসনে রাজ নারায়নের কাছে পরাস্ত হলেন। সঞ্জয় আমেথি'র আসন হারালেন একজন দুর্বল প্রতিপক্ষের কাছে। দক্ষিণ ইন্দিরার প্রতি অনুগত রইল, জরুরী অবস্থা সেখানে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রা ছাড়িয়েছে। জনতা দলের বিজয়ের বিষয়টি বোঝা যাচ্ছিল। ভারতের জনগণ জরুরী অবস্থাকে প্রাথমিক ভাবে স্বল্প সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তা জীবনের অংশ করে নিতে অস্বীকৃত ছিল। ইন্দিরা গান্ধী স্টেইক-সুলভ নির্বিকার চিত্তে আত্মসংযমের সাথে খবরটি গ্রহণ করলেন। তাঁর আশা ছিল তিনি নির্বাচনে জিতবেন এবং পুরোপুরি তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা মাইকেল ফুট তাঁর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া এবং ভারতের জন্যে তার সম্ভাব্য গুরুত্বের বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "কিন্তু সেই মুহূর্তে যখন তাঁর সমস্ত আশা-ভরসা তছনছ হয়ে গেছে, তখন তিনি সেই পরাজয় সাবলীল এবং অভিজাতসুলভ মনোভাব নিয়ে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলেন। সম্ভবতঃ ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল সেটা।"

নির্বাচনের চমকে দেশে একটা দমবন্ধ সতর্ক অবস্থা বিরাজ করছিল। জনতা দল তার নেতা নির্বাচনের অপেক্ষায় ছিল। বাস্তবতা ছিল এ রকম যে ফ্রন্টটি ছিল অনেকগুলো দলের একটি টিলেঢালা সংগঠন। ১৯৬৯ থেকে কংগ্রেস-এর একটি ক্ষুদ্র অংশের নেতৃত্বে ছিলেন মোরারজী দেশাই; চরণ সিং-এর অনুসারী সমাজতন্ত্রী, আর জগজীবন রামের ডানপন্থী দল 'হিন্দু জন সংঘ' দ্রুতবেগে গণতন্ত্রের জন্য কংগ্রেস গঠন করে ফেলল। তাদের সম্মিলিত বিজয়ের পর এক মাসেরও বেশী সময় গেল। আগে এই অসম দলগুলো জনতা দলের ব্যানারে জড় হয়েছিল। জয়প্রকাশ নারায়নের আশীর্বাদ নিয়ে মোরারজী দেশাই পার্টিপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন।

পরবর্তী আড়াই বছর ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের হাস্যকর একটা সময়। মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করলেন এবং দেশের যাবতীয় অর্জনকে ধুলিসাৎ করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজ নারায়ন সমস্ত রকম পরিবার পরিকল্পনা বন্ধ করে দিলেন এবং পরামর্শ দিলেন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ঔষধি উদ্ভিদ খেতে। তিনি সংসদে হিন্দি চালু না হওয়া পর্যন্ত

www.pathagar.com

প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীর মত তিনিও মূত্র-চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং গোড়া মৌলবাদী ছিলেন। চরন সিং যন্ত্র-ব্যবহার বিরোধী (Luddite) হিসেবে শিল্প উন্নয়নের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত অনুযায়ী ধনী কৃষকরা হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি পরবর্তীকালে এমন চমৎকার একটি বাজেট প্রণয়ন করেছিলেন যে আহার্য সামগ্রী থেকে শুরু করে সাবান পর্যন্ত সমস্ত কিছু বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

এই সার্কাস-মন্ত্রীদের সভাপতি মোরারজী দেশাই ছিলেন ক্যালাভিনিস্টিক (Calvinistic) চরিত্রের। মানবতার প্রতি তাঁর সামান্যই শ্রদ্ধা ছিল। যে সব জিনিস তার বোধগম্য ছিল না, সে সবের জন্যে তিনি সময়ও তেমন দিতেন না। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্রমশঃ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হতে থাকল। অবশেষে তাঁর ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের বৈজ্ঞানিকদের অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে পড়ল যে অনেক শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক ঘৃণা এবং গুরুত্বের সাথে দেশের বাইরে চলে যাবার কথা বিবেচনা করছিলেন, যেখানে তাদের দক্ষতা অন্ততঃ মর্যাদার সাথে গৃহিত হবে। অর্থনীতির বিশেষ তিনটি দিক এ সবের কারণে খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল : তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, পারমানবিক শক্তিকে শক্তির কাজে ব্যবহার করবার জন্য পরিকল্পনা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ।

কিন্তু জনতা সরকারের প্রধান মাথাব্যথা ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। পররাষ্ট্র মন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তাঁকে 'ইতিহাসের আর্বজনা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর সহকর্মীরাও উপলব্ধি করতেন যে তিনি তখনও তাদের বিপদের কারণ। রোমানদের মত, জামা (Zama)-তে হানিবলকে হারানোর পরেও তাঁর ভয়ে তারা তটস্থ্ থাকত। জনতা দলের নেতারাও ইন্দিরা গান্ধীর নামে ভূতগ্রস্থ্ ছিলেন। তাদের ক্ষীণ একতার শক্তিই ছিল তাঁকে ভয় পাওয়া এবং তাঁর প্রতি ঘৃণা।

ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পতনের প্রথম দিকের সপ্তাহগুলোতেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির আঘাত স্পষ্ট ভাবে অনুভব করতে পারলেন। সে সময়ে রাজনীতি থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত জীবনের খামখেয়ালীপনা নিয়ে কথা বলা হচ্ছিল তাঁর নিস্তেজতার চিহ্ন হিসেবে। কংগ্রেসের পতন ডেকে এনেছিল ক্রমাগত দলদ্রোহিতা, যার নেতৃত্বে ছিলেন যশবন্ত রাও চ্যাবন, করন সিং এবং স্মরণ সিং-এর মত প্রাক্তন মন্ত্রীরা। চ্যাবন অকস্মাৎ ইন্দিরা গান্ধীর ব্যর্থতা আবিষ্কার করতে শুরু করলেন। তিনি বিস্মৃত হলেন যে নিজেই তিনি

www.pathagar.com

সেই সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। দল আবারও ভাঙলো ১৯৭৮-এর জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস (আর) নামে। তখন তারা ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস (আই)-এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করল।

যাহোক জনতা দলের ভয় এবং হীন প্রতিহিংসাপরায়নতা ইন্দিরা গান্ধীকে ভাল এবং নির্ভুলভাবে জাতীয় মঞ্চে ফিরিয়ে আনল। ১৯৭৭-এর অক্টোবর মাসের ৩ তারিখে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিংহ-এর আদেশে তিনি গ্রেফতার হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হল। কিন্তু কোন প্রমাণ হাজির করতে না পারায় দিল্লীর মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট পরদিনই তাকে মুক্তি দিলেন। পুরো নাটকটি শেষ হল। ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ দেওয়া যায় দূরদর্শন ক্যামেরা এবং কাগজের সাংবাদিকদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার সহজাত চমকপ্রদ প্রবৃত্তির সার্থক প্রয়োগের জন্যে।

এই একক নাটকের বিপরীতে সুপ্রীম কোর্টের একজন মুখ্য বিচারক জে.সি শাহ'র অধীনে শাহ কমিশন গঠন করা হল, যারা জরুরী অবস্থাকালীন বাড়াবাড়িগুলোর তদন্ত করে দেখবে, যা জাতির পক্ষে দীর্ঘতম অবিরাম পরম্পরায় পরিণত হল। বিচারক পরিষ্কারভাবে তাঁর ওকালতি ব্যবসার সুদিন দেখতে পেয়েছিলেন। একজন কোপন স্বভাবের বৃদ্ধ মানুষ মূল সাক্ষীর প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন। তার চিত্ত বিক্ষেপ ঘটাচ্ছিল ইন্দিরা গান্ধীর সেই সব প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করায় যা তাঁর অফিসের গোপনীয়তা ভঙ্গ করবে বলে তিনি মনে করছিলেন। তিনি সঞ্জয়কে এক মাসের কারাবাসের আদেশ দিলেন সাক্ষীর দুষ্কর্মে সহযোগিতা করার জন্যে। শেষ অবধি কমিশন ইন্দিরা গান্ধীর দুষ্কর্মের একটা উদ্ভট অভিযোগ প্রণয়ন করে, কিন্তু তত দিনে তা একই সাথে "স্টার চেম্বার" এবং কমিক অপেরায় পরিণত হয়েছে। জনগণের কাছে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা আর ছিল না।

ইতিমধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। তিনি প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করছিলেন। দেশের সর্বত্র কষ্টকর পদযাত্রা তিনি চালিয়ে গেলেন; জনসভাগুলোতে ভাষণ দান করলেন, মানুষের তৈরী দৃশ্যপট দেখলেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা মনে হত অভ্যাসগতভাবে ভারতকে আঘাত হানছে, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। তিনি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে জনতার ভিড়ে মিশে যেতেন। তাদের দুঃখের ভাগ নিতেন, তাদের কষ্টে সান্ত্বনা দিতেন যখন রাজধানীতে তাঁর বিরোধীরা সরকারে অসূর্যম্পর্শ হয়ে বিরাজ করছেন। নিজেদের ভেতরেই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি তাদের অথর্ব করে ফেলেছিল।

www.pathagar.com

সাধুতার খ্যাতি কিন্তু জনতা দলের দুর্নীতিকে আর লুকিয়ে রাখতে পারছিল না। মোরারজী দেশাই-এর ছেলে ক্যান্তিলাল তার বাবার প্রভাব কাজে লাগিয়ে নিজের আখের ভালভাবে গুছিয়ে নিয়েছে বলে কথিত ছিল। সুতরাং তাকে তদন্তের মুখোমুখি হতে হল। কিছু কিছু মন্ত্রীরা তা দৃঢ়তার সাথে সমর্থন জানালেন, বিশেষ করে চরণ সিং এবং রাজ নারায়ন। জগজীবন রামের ছেলের যৌন-কেলেঙ্কারীর খবর সন্দেহপূর্ণ ছবিসহ জাতীয় এবং দিল্লী'র কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হল, যা তার বাবার জন্যে তীক্ষ্ণ অস্বস্তির কারন হল। মিঃ রামকেও ব্যাখ্যা দিতে হল কী ভাবে তিনি গত দশ বছর আয়কর দেয়া এড়িয়ে গেছেন। যাহোক, দেশাই-এর ওপর এই চাপ জনজীবনে যে কোন ধরনের সততার ক্ষেত্রেই সামান্যই প্রভাব ফেলেছিল। এ ছিল কেবল একটি সতর্ক-সঙ্কেত যে, তাঁর মসনদের ওপর সহকর্মীদের লোভ আছে এবং তা' অন্তর্ঘাতী কলহের অংশ, যা জনতা মন্ত্রীসভাকে জন্ম থেকেই তাড়িত করেছে।

জুলাই ১৯৭৮-এ কর্তৃপক্ষ ইন্দিরা গান্ধী, সঞ্জয় এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কোর্টে দু'টি মামলা দায়ের করল জরুরী অবস্থাকালীন বাড়াবাড়ি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার প্রসঙ্গে। অব্যাহত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও হতোদ্যম না হয়ে ইন্দিরা গান্ধী নভেম্বরে কর্নাটকের চিকমাগালুর-এ উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন এবং জিতলেন। কিন্তু দেশাই-এর সাধ তাঁকে গ্রেফতার এবং লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা। কারণ, তিনি বিশেষ অধিকার আইনের অপব্যবহার করেছেন এবং লোকসভাকে অবজ্ঞা করেছেন যখন ১৯৭৫-এ মারুতি সংক্রান্ত সরকারী তদন্ত চলছিল; তখন তাদের নাকাল করেছেন মর্মেও অভিযোগ করা হল। সংসদ বিষয়ক বিশেষ অধিকার কমিটি নীতিগত ভাবে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করল এবং ডিসেম্বরের ১৯ তারিখে তাঁকে গ্রেফতারের জন্য পরওয়ানা জারী করা হল। আরও একবার প্রচারের সুবর্ণ সুযোগ এলো। ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ়তার সাথে বললেন যে পুলিশ তাঁকে সংসদের ফ্লোর থেকে তুলে এনেছে। প্রেস, বেতার এবং দূরদর্শন দেশের স্বার্থে বিষয়টি রেকর্ড করে রাখল। ২৬ ডিসেম্বর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন।

১৯৭৯'র নতুন বছরের শুরুতে জর্জ ফার্নান্দেজ জনতাকে খেপিয়ে তুললেন ইন্দিরা গান্ধী বহুজাতির সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছেন —এই অভিযোগ তুলে এবং সংসদ থেকে তাঁকে বহিষ্কারের আহ্বান জানালেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তখন জানালেন যে বহিষ্কারের অর্থ হবে—ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর আসন হারাবেন। সেখানে আরও

www.pathagar.com

নাটক ছিল। কর্ণাটকের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ উরস্ জনতা সরকারকে খুশি করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে উপেক্ষা করলেন। এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য গ্রোভার কমিশান নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে কংগ্রেস (আই) উরস্‌কে দলের সভাপতির পদ ত্যাগ করার আদেশ দেয়; তার ফলেই তাঁদের মধ্যে চূড়ান্ত ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু কংগ্রেসের সব দুঃখ-কষ্ট জুড়িয়ে গেল জনতা সরকারের মৃত্যু যন্ত্রণায়। চরণ সিং এবং দেশাই-এর মধ্যে সংঘাত শুরু হল। তাঁরা আলাদা হলেন, আবার একত্র হলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রীসহ। রাজ নারায়ন খোলাখুলি ভাবে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করলেন এবং জুলাই-এর ৯ তারিখে পার্টি ছাড়লেন। ৬ দিন পর ১৫ জুলাই তিক্তবিরক্ত দেশাই পদত্যাগ করলেন। ২৮ জুলাই চরণের আজন্ম সাধ প্রধানমন্ত্রী হওয়া পূর্ণ হল আর একটি ছিদ্রময় জোটের প্রধান হিসেবে যা আগস্টের বিশ তারিখে ভেঙ্গে পড়ল ২৪ দিন ক্ষমতায় থাকবার পর। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী সংসদে আস্থা-ভোট লাভে ব্যর্থ হলেন, তিনি রাষ্ট্রপতিকে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিতে অনুরোধ করলেন। সেটি অনুষ্ঠিত হল ১৯৮০'র ৬ জানুয়ারী। জনতা সরকারের পরীক্ষা-নীরিক্ষা অসংলগ্নতার মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু চরণ সিং-এর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চার মাস টিকে ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে তারা সব রকম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। খাদ্য-ঘাটতি এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা কখনো বাড়েনি, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কখনো কমেনি, তবু জিনিসপত্রের দর মুদ্রাস্ফীতির কারণে আকাশে চড়লো। স্বাধীনতার পর এই প্রথম জি.এন.পি.'র (Gross National Product) পরিমাণ হ্রাস পায়। জনতা সরকারের আড়াই বছরের শাসনামলে ভারতের অগ্রগতি দশ বছর পিছিয়ে গেল। তৎসত্ত্বেও এই সাময়িক দুঃখ-কষ্ট ভারতীয় জনগণের জন্যে অমূল্য শিক্ষা বহন করেছিল।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন

ইন্দিরা গান্ধী ঝড়ের বেগে প্রতিপক্ষকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংসদে ফিরে এলেন। তিনি বিজয় ছিনিয়ে নিলেন চরম দুর্দশার ভেতর থেকে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর পুনরাবির্ভাব ছিল ভারতীয় আকাশ-ছোঁয়া মূর্তির মত। সেটি অর্জন করতে তিনি আস্থার সাথে নির্ভর করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী, সাহস, নিখুঁত কৌশলী পরিকল্পনার দক্ষতা, অতুলনীয় "ক্যারিশমা", তার ছেলে সঞ্জয়ের সাংগঠনিক ক্ষমতা, তিনি মায়ে'র নির্বাচনী প্রচারের পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং প্রধানত তাঁর বিরোধী জনতা পার্টির মূঢ়তা এবং লোভের ওপর। একজন দক্ষ জেনারেলের মত তিনি তাদের ভুল এবং দুর্বলতাগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন। ১৪ জানুয়ারী, ১৯৮০, ইন্দিরা গান্ধী তাঁর জীবনের চতুর্থ এবং শেষ বারের মত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন।

ভারত তখন অজস্র চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। জনতা সরকার যে ধ্বংসাবশেষ ফেলে গেছে প্রথমেই তা পরিস্কার করতে হল। সরকারের জংধরা যন্ত্রপাতি আবার কার্যক্ষম করতে হল। অবজ্ঞা এবং নিরক্ষরতার আগাছা, যা অর্থনীতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল, তা পরিস্কার করার দরকার হল। শিল্পজাত উৎপাদন পুনরুজ্জীবিত করতে হল। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহিত করা হল এবং বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের আবারও তাদের সৃষ্টিশীলতা এবং আবিষ্কারের কাজে প্রেরণা দেয়া হল।

কিন্তু সময়টা ছিল অবনতিশীল নিরাপত্তা ব্যবস্থার। সেটি স্পষ্ট হয়েছিল ২৭ ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েতের আফগানিস্তান অভিযানের মধ্য দিয়ে, যা প্রধানমন্ত্রীর তাৎক্ষণিক মনোযোগ দাবি করছিল। এর ফলে ভারত বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছিল এবং জরুরী ভিত্তিতে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারও পুনঃমূল্যায়ন করতে হল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং এ বিষয়ে একেবারেই নির্বোধ ছিলেন। লেখক ভবানী সেনগুপ্তের ভাষায়, "আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল বিষয়ে তিনি ততটাই স্বচ্ছন্দ ছিলেন, যতটা একটা মহিষ কান্টের দর্শনের বিষয়ে স্বচ্ছন্দ।"

www.pathagar.com

মিঃ সিং-এর পূর্বসূরি মোরারজী দেশাই সতর্কতার সাথে গড়ে তোলা ইন্দো-সোভিয়েত সম্পর্ক ভাঙ্গতে সমর্থ হননি, যদিও বিরোধী দলে থাকতে তিনি এক সময় সে রকমই ইচ্ছে পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল "যথার্থ জোট-নিরপেক্ষতা"কে ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি থেকে উপড়ে ফেলা। এই অশুভ মনোযোগের উদ্দেশ্য ছিল চীন-আমেরিকা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মত চীনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্রুত প্রচেষ্টা নেয়া, কিন্তু ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যেদিন সরকারী ভ্রমণে পিকিং-এ পা রাখলেন, সেদিন ১৯৭৯'র ফেব্রুয়ারী মাসে চীন ভিয়েতনামে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণ চালায়। ফলে তাঁর এই সরল প্রত্যাশারও সমাপ্তি ঘটে। এর সাথে আরও ছিল ডেং ঝিয়াওপিং-এর মন্তব্য যে, ভিয়েতনামের একটা শিক্ষা দরকার ছিল যেমনটি ভারত পেয়েছিল ১৯৬২-তে। এতে প্রমাণ হল, ঐতিহ্যবাহী চীনা ঔদ্ধত্য এখনও চীন-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নের পথে একটা বড় বাধা। বাজপেয়ী বিষন্ন চিত্তে ঘরে ফিরলেন এবং বিষয়টি তখনকার মত মুলতুবি রইল। (টীকা দেখুন, পৃ. ৯২)

ইন্দিরা গান্ধীর বিষয়সূচির মধ্যে প্রথম সমস্যা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আফগানিস্তান এবং ভারতের সম্পর্ক বিষয়ক। সেটি তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনেন পরস্পর আস্থা এবং সমঝোতার ভিত্তিতে। তিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতিকে বিবেচনা করেন পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এবং ওয়াশিংটন কর্তৃক দু'দেশের মধ্যে সন্তপ্ত অবস্থা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার লক্ষ্যে। আফগান সঙ্কট হ্রাস করার বিষয়ে তিনি অনুভব করতেন সোভিয়েত সৈন্য তুলে নেয়া অবশ্যই উচিত। পশ্চিমা সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ কণ্ঠকে বন্ধ রাখতে তিনি অস্বীকার করেন। অতীতে পশ্চিমা শক্তি কর্তৃক অন্য দেশে অনধিকার প্রবেশ এবং দখলদারীকে তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন চীনের ভিয়েতনাম আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে পশ্চিমের নীঃশব্দ প্রতিক্রিয়া, যা চীনের দ্বৈত অবস্থানের প্রমাণ। নিকারাগুয়ায় স্যানডানিস্তা শাসনকে উড়িয়ে দেবার জন্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের উদ্যোগ এবং গ্রানাডায় অনধিকার প্রবেশের বিষয়ে বোঝা যায় ইন্দিরা গান্ধীর বিবেচনার সঠিকতা।

ওয়াশিংটনের অভিপ্রায় ছিল আলাদা। আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতি আমেরিকা এবং তার সহযোগীদের কাছে ছিল মস্কোকে দীর্ঘ সময়ের জন্যে ব্যয়বহুল যুদ্ধে আটকে ফেলার ঈশ্বর প্রেরিত একটা সুবর্ণ সুযোগ। তাদের পরিকল্পনা সার্থক ভাবে প্রয়োগ করার জন্য পাকিস্তান তাদের নিস্কাশনের নালায় পরিণত হয়েছিল। কাবুলে বাবরাক কারমাল

www.pathagar.com

সরকারের সাথে যুদ্ধরত গেরিলাদের জন্য আমেরিকান, মিশরীয় এবং চায়নিজ যুদ্ধাস্ত্র পাকিস্তান থেকে তাদের হাতে পৌঁছাত। জিয়া-উল হকের শাসন ছিল সামরিক একনায়কতন্ত্রের, কাজেই কোথাও কোন দ্বিমত ছিল না। এবং যাকে বলা হত সোভিয়েত সম্প্রসারনবাদ, তার বিপরীতে ইসলামাবাদকে সামনের সারির সরকার হিসেবে নির্বাচন করা হল। সেখানে আরও বোনাস যুক্ত হল। ইরানে শাহ'র পতনের পর পাকিস্তান আরব উপসাগরে আমেরিকান পুলিশের চাকরী পেল।

পারমানবিক অস্ত্র বন্ধের কর্মসূচি শুরু হবার লক্ষণ দেখা দেয়া সত্ত্বেও দূরপাল্লার প্রাণঘাতী এবং অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ঢেলে দেয়া হল পাকিস্তানে। দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ভারসাম্য বিপদের সম্মুখীন হল, বিশেষ করে ভারতের। এবং ইতিহাস যদি কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকে সেটা ছিল এই যে, এ ধরনের পরিবর্তনের ফলেই সম্ভবতঃ পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ভারতের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হয়েছিল। যার ফলে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১'র যুদ্ধ দু'টি ছিল মহার্ঘ্য স্মারক।

এ ব্যাপারে ভারতীয় সংবেদনশীলতা এবং যুক্তিতর্ক নতুন রেগান প্রশাসনের বরফ সামান্যই গলাতে পারল। সেখানে তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হচ্ছিল। ইউ. এস. প্রেসিডেন্ট যে দেশটির বর্ণনা দেন, "একটি অশুভ সাম্রাজ্য" বলে। বস্তুত পেন্টাগনের ভেতর এবং অন্যত্রও কিছু শক্তিশালী গোষ্ঠি ছিল যারা মনে করত সামরিক প্রতিযোগিতার গতি বৃদ্ধি করলেই ফল হবে রাশিয়ার পতন। একটি অত্যন্ত শক্তিশালী জাতির বিষয়টি যদি এ রকম হয়, তাহলে ভারতের মত একটি দুর্বলতর দেশের জন্যে আর বেশী কী হবে? ভারতের ওপর চাপ প্রয়োগের কৌশলটি যাই হোক নতুন কিছু ছিল না। এটা ছিল কিছু পরিমাণে ১৯৫৪'র পাকিস্তান-ভারত এবং ইউ.এস.-এর মধ্যকার সঙ্কটের মত। তখনও এখনকার মত পাকিস্তানের জন্যে আমেরিকা জাহাজে অস্ত্রের চালান পাঠাচ্ছিল, যা ভারতকে আপত্তি জানাতে বাধ্য করেছিল। সে সময়ে নতুন দিল্লীতে ক্যানাডিয়ান রাষ্ট্রদূত স্কট রেইড তাঁর এক আমেরিকান সহকর্মীর কথোপকথনের সারাংশ নথিবদ্ধ করেন; তিনি ছিলেন ভারতের সিআইএ'র প্রধান কর্মকর্তা। রেইড লেখেন, "আমরা বিশ বছর আগে অক্সফোর্ডে পরস্পর পরিচিত হই। ১১ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখে আমরা দেড় ঘন্টা কথা বলি। তাঁর কথা বলার ধরন ছিল তীর্যক, কিন্তু আমি তথ্য নিয়েছি সে কী বলে সেখান থেকে। তাঁর যুক্তির গতি যে রকম ছিল: পশ্চিমা শক্তির জন্যে দুটো বিশ্বযুদ্ধেরই ভারত ছিল অধিকাংশ ফৌজের উৎস।....ভারত হল

www.pathagar.com

সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিমের জন্যে একমাত্র ফৌজের উৎস। যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি ভারতকে নিঃসঙ্গ করতে পারে। ভারত বুঝতে পারবে যে পাকিস্তানের সাথে সঙ্গতি রেখে তার পক্ষে যুদ্ধোপকরণ মজুত সম্ভব নয়, কারন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে যেন ভারতকে অস্ত্র না দেয়। এবং আরো দেখা যাবে যে ভারত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আমদানী করতে পারছে না।" যুক্তরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে বিশেষ ক্ষেত্রে এমন কী ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারে এবং এই সব "ঘটনায় নেহেরু এবং কংগ্রেস পার্টি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ডানপন্থী হিন্দু গ্রুপ জনসংঘ শক্তিশালী হবে। তাদের কিছু কিছু সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য সমর্থন দিতে প্রস্তুত ছিল। পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে এমন অবস্থায় ফেলা যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক চুক্তি করা ছাড়া আর কোন উপায় না থাকে। এটা করতে পারলে ভারতকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভয় দূর হবে এবং সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত পশ্চিমের জন্য অধিকাংশ ফৌজের উৎস হবে।"

এই ধরনের চাপ অবিরত ভাবে ১৯৬০ পর্যন্ত চলেছে কাশ্মীর বিষয়ে, চীনের সাথে যুদ্ধের পর ভারতকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহে আমেরিকার প্রতিশ্রুতিতে অথবা জাহাজে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহে ভারতের অনুরোধ সম্পর্কে। ধাপ্পাবাজি চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ পেল ১৯৭১-এর আগস্টে, ভারত যখন বন্ধুত্ব-চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক জোরদার করল। ইন্দো-সোভিয়েত সহযোগিতা ভারতকে তার প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার জন্যে তার সামরিক শক্তিকে সমন্বিত আধুনিকায়নের সুযোগ দেয়। সেনাবাহিনী, বিমান-বাহিনী এবং নৌ-বাহিনীর জন্য সোভিয়েতের সব ধরনের যুদ্ধাস্ত্রের গঠন এ রকম যে অন্য কোথাও তা মিলবে না। স্থানীয়ভাবে অনুমতি সাপেক্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন অস্ত্র তো ছিলই; তার সাথে ভারতীয় নিজস্ব গবেষণা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিরক্ষা সরঞ্জামে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশকে গুরুত্বপূর্ণ এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সহযোগিতার ফলে সাধারণভাবে অথবা ভারতীয় অর্থনীতির সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেশের শিল্পায়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ইস্পাত, বিদ্যুৎ, তেল এবং সার কারখানাগুলো এই সম্পর্কের ফলে সব চেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে। বেসরকারী ব্যবসা ক্ষেত্রে তার উদ্দীপক ভূমিকা এখন স্পষ্ট। ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এ্যান্ড ইণ্ডাষ্ট্রী সম্প্রতি উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল মস্কোতে

www.pathagar.com

পাঠিয়েছে নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করতে যেখানে যৌথ প্রচেষ্টায় কাজ করা যাবে। বিশাল সোভিয়েত মার্কেটে প্রবেশের ফলে বিশ্ব বাণিজ্যের কিছু ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ভারত রক্ষা পায় এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের মত প্রতিষ্ঠানের সাথে আস্থার সাথে কাজ করতে সক্ষম হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবসায়ী অংশীদার। তাদের অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক নিবিড় সখ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে মিলিতভাবে চমৎকার মহাকাশ অভিযাত্রা। যে মুহূর্তে রাকেশ শর্মা সোভিয়েত সয়ূজ মহাকাশযানে প্রবেশ করলেন, আর আকাশে ভেসে গেলেন দূর থেকে দূরে, সেই মুহূর্তে তিনি ভারতের প্রথম মহাকাশযাত্রী। যে সম্মান এবং মর্যাদা মস্কো ভ্রমণকালীন সময়ে ইন্দিরা গান্ধী পেয়েছেন, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ এবং এন্ড্রোপভের অন্তেষ্টিতে, তাঁর নামে একটি সোভিয়েত জাহাজ, মস্কোর একটি সড়ক এবং স্কুল, তাসখন্দে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আস্কাবাদে একটি মেডিক্যাল স্কুল এবং লাইব্রেরীর নামকরণ এবং তাঁর মৃত্যুর পর তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ইন্দো-সোভিয়েত সম্পর্ক উন্নয়নে তাঁর অসামান্য ভূমিকার কথা; সমসাময়িক বিশ্বে তা ছিল অন্যতম মজবুত সম্পর্ক।

১৮৪৮-এ হাঙ্গেরিয়ান বিদ্রোহীদের দমনে রাশিয়ান সৈন্যদলের সহযোগিতার পর অস্ট্রিয়ান মিনিস্টার সোয়ার্জেনবার্গ-এর উদ্ধৃতি, "কোনদিন আমাদের কৃতঘ্নতা দিয়ে আমরা এই পৃথিবীকে বিস্ময়ে অভিভূত করব।" ১৯৭১-এ হেনরী কিসিঞ্জার রাষ্ট্রদূত ডব্রেনিন-কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে ভারত একই ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিদান দিতে পারে। এই বিজ্ঞ ডক্টরটি যথারীতি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। যাই হোক না কেন, তিনি যখন খুশি মত বদলাতেন না।

কিন্তু ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন নিশ্চিতভাবে কিছু কিছু আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে, তাদের সম্পর্কে কোন অবস্থাতেই সব ব্যাপারে একই মনোভাব পোষণ করছে, এমনটি বলা যাবে না; অন্যান্য দেশের সাথে ভারতীয় সম্পর্কের ব্যাপারেও তা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন দিল্লির এজিয়ান (ASEAN) ব্লকের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে কম্পুচিয়ার হেং সামরিন (Heng Samrin) সরকার এবং চীন ও পশ্চিমি সহযোগিতায় পলপট এবং তার সহযোগীদের গণহত্যার বিপরীতে ভিয়েতনামের কঠিন সংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছে দিল্লী, যেখানে এজিয়ান ছিল বিপরীতমুখী।

www.pathagar.com

একই ভাবে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রকম হের ফের না করেই ভারত বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী এবং ইউরোপীয় গোষ্ঠির সাথে সর্বতোভাবে আন্তরিক এবং সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রেখেছে। এর ফলে নানা দিক দিয়ে সুফল পাওয়া গেছে। বাণিজ্য, শ্রমশক্তি, কৃষি, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি, সব কিছুতে। বৃটেনের ক্ষেত্রে, ভারতের সাথে যার বন্ধনের ভিত্তি ঐতিহাসিক, যেখানে বর্তমানে ৫ লক্ষ ভারতীয় বাস করে, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সেখানে গভীরভাবে পরিপূরক শক্তি।

১৯৮২-তে বৃটিশ এবং ভারতীয় সরকারের যুক্ত অর্থায়নে বৃটেনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় উৎসব ছিল দারুণ একটা সাফল্যের বিষয়, অতীতের হিস্যার বিষয়ে সাম্প্রতিক তাগাদা সত্ত্বেও। ইন্দিরা গান্ধী লন্ডন গেলেন উদ্বোধন করতে, এতে করে ভারত-বৃটিশ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তাঁর গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। আরও বিস্তৃত করে বললে, তিনি ছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী ও পিতার মত, দু'দেশের ভেতর সেতুবন্ধনরূপে কমনওয়েলথ-এর প্রতি একই রকম সুবেদী অনুভবসম্পন্ন এবং একটি পরস্পর মুখাপেক্ষী পৃথিবীর মানুষের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তার বিবর্ধিত ভূমিকা। ১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রপতি ভবন প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ অধিবেশনে ইন্দিরা গান্ধী যখন কমনওয়েলথ-এর উদ্দেশ্যে তাঁর ক্রিসমাস বেতার-ভাষণ দেন, বৃটেনের রানী তখন নতুন দিল্লী আসেন। এ ব্যাপারে বৃটিশ সংবাদমাধ্যমগুলোর অসুস্থ সমালোচনার ফলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁর স্বদেশীরা সবাই কমনওয়েলথ টিঁকে থাকার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না।

ফ্রান্সের সাথে ভারতের সম্পর্কটিও ইন্দিরা গান্ধীর স্পর্শে বিকশিত হয়। প্রেসিডেন্ট মিতেরঁ তাঁর পক্ষ থেকে তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়নের জন্য ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ককে আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি এবং ইন্দিরা গান্ধী পারস্পরিকভাবে ভারত এবং ফ্রান্স ভ্রমণ করেন। ইন্দিরা গান্ধী ফ্রান্সের প্যারিসে জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে তিনি আনবিক যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রোগব্যাধী এবং আরো বহুমুখী যে সব বিপদ মানব জাতির অস্তিত্বের জন্যে হুমকি স্বরূপ, সেই সব বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার আহ্বান জানান। বস্তুত এই গ্রহের সব ক'টি জীবন গভীর সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে। তিনি পৃথিবীর সব জাতির কাছে এই মর্মে অনুরোধ রাখেন যে মানবতার চেয়ে তাদের রাজনীতি যেন বড় হয়ে না ওঠে।

ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের সম্পর্ক একটা বাস্তব অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর মামুলি মন্তব্য অথবা চীনের সাথে দু'হাজার বছরের পুরনো বন্ধুত্ব ছিল,—এ

www.pathagar.com

রকম মন্তব্য ও ধারণা এ সব বিষয় আরও ভাল বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে। এই ধরনের অলঙ্কারশাস্ত্র বিভ্রান্তিকর মতভেদের কারণ হয় এবং যে সব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ সত্যিকার ভাবে মিলতে পারত, সে সব জায়গাগুলোর ওপর পর্দা টেনে দেয়। মাও'র দুর্বল হাত থেকে মুক্ত হবার পর ইন্দিরা গান্ধী উৎসাহের সাথে চীন–ভারত সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি ঘটান। যখন ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা নবজীবন লাভ করেছে।

উপমহাদেশে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের বিষয়ে ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে এটা সব চেয়ে ভালভাবে কার্যকর হতে পারে দ্বিপার্শ্বিক এবং আঞ্চলিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে। কিন্তু অবশ্যই তা হতে হবে বিদেশী হস্তক্ষেপমুক্ত।

জওহরলাল নেহেরু তাঁর ইতিহাসের তীক্ষ্ণ চেতনা নিয়ে প্রবল ভাবে চেষ্টা করেছিলেন উপমহাদেশকে ঠাণ্ডা-যুদ্ধের ক্ষয়িষ্ণু প্রচন্ডতা থেকে মুক্ত রাখতে। তার জন্যে পাকিস্তানের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল মুখ্য, কিন্তু আর যদি কোন কারণ না-ও থাকে, কেবল মনস্তাত্বিক কারণেই তা ছিল অসম্ভব। পাকিস্তানের নেতারা পশ্চিমের সাথে গাটছড়া বাঁধবার পথ খোঁজে ভারতকে জব্দ করবার জন্যে। যদিও তাতে প্রধান সুবিধাভোগী হয় আমেরিকা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে লড়বার জন্যে পাকিস্তান ছিল তাদের প্রয়োজনীয় সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধি। সব দিক উপলব্ধি করেই একটি দেশ অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

১৯৭২-এ স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তিতে ইন্দিরা গান্ধী এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো কাশ্মীর এবং ভারত-পাকিস্তানের অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে দু'দেশের সম্পর্কের চৌহদ্দির ভেতরে থেকেই বলপ্রয়োগের পরিবর্তে অন্য সমাধানের বিষয়ে একমত হন। কিন্তু ১৯৭৭-এ জেনারেল জিয়াউল হকের ক্যু, ভুট্টোকে পদচ্যুত করা এবং ফাঁসিতে ঝোলানো যুক্ত হয় আফগান সঙ্কট এবং সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির সাথে। ডিসেম্বর ১৯৭৯-থেকেই সামরিক অবস্থা আমূল বদলে যেতে শুরু করে। দৃশ্যপট আগের অবস্থানে ফিরে যায়। ইসলামাবাদ আবারও নতুন ঠাণ্ডা-যুদ্ধের উপাদানে পরিণত হয়। তৎসত্ত্বেও ওয়াশিংটনের উৎসাহে জিয়া উল হক ভারতের সাথে একটি যুদ্ধ নয় চুক্তির জন্য প্রস্তাব করে, যা তার পূর্বসুরীরা কখনো গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর মধ্যে বিশেষ লক্ষনীয় বিষয় ছিল এই যে এই আয়োজন দ্বারা তাঁদের নিজ নিজ দেশে

www.pathagar.com

বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি বন্ধের ব্যবস্থা করা। ভারতের জন্যে এ ধরনের যে কোন চুক্তি ছিল সামরিক ঘাঁটি সম্প্রসারণ মেনে না নেবার লক্ষ্যে প্রশস্ত সমবেদনার ভিত্তি নির্মাণের মত। কিন্তু পাকিস্তান একই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। জিয়ার মতে সেটি করলে জাতীর সার্বভৌম ক্ষমতার অবক্ষয় হবে। বিষয়টি আরো জটিল হয়ে গিয়েছিল পাঞ্জাবে শিখদের তীব্র উগ্রতায় পাকিস্তানের ইন্ধন যোগানোর ব্যাপারে ভারতীয়দের প্রবল সন্দেহের কারণে। সে সময় পাকিস্তান সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রেস এবং সংবাদমাধ্যমে মারাত্মকভাবে ভারত-বিরোধী প্রচারণা চলছিল, এবং বিশেষ করে পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রহণকারী একজন ভারতীয় বিমান-ছিনতাইকারী শিখ-এর বিরুদ্ধে জিয়া-সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতায়। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক উন্নয়নে শেষ পর্যন্ত অচল অবস্থার সৃষ্টি হল দৃশ্যপট থেকে ইন্দিরা গান্ধীর প্রস্থানের পর।

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং নেপালের মত প্রতিবেশী দেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক যথারীতি কম জটিল, কিন্তু আন্তরিকতা থেকে বহু দূরে। এদের মধ্যে শ্রীলঙ্কায় গুরুতর সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞ চলছিল দ্বীপটির সংখ্যাগুরু সিংহলী এবং সংখ্যালঘু তামিলদের মধ্যে। ইন্দিরা গান্ধী শ্রীলঙ্কার অখন্ডতার প্রতি সমর্থন নিশ্চিত করবার পর ভারতের নিজস্ব ৫ কোটি তামিলের ভেতর আবেগের তীব্রতা অনুভব করে বিবাদমান দল দু'টির ভেতর মধ্যস্থতা করবার প্রস্তাব দিলেন। কলম্বোতে প্রেসিডেন্ট জয়বর্দ্ধনে আর তাঁর সহকর্মীরা প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন শ্রীলঙ্কার মন্ত্রী এবং সংবাদমাধ্যম ভারতের উদ্দেশ্যে সমালোচনার ঝড় তুলেছিলেন। অভিযোগ ছিল ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীতার যথেচ্ছচার প্রসঙ্গে। কিন্তু তিনি (ইন্দিরা গান্ধী) স্পষ্ট ভাবে জানতেন তাদের প্রচন্ড সমস্যার ইতিহাস। নাগরিক অধিকার বঞ্চিত তামিল চাষীদের বৃটিশ-রাজ জাহাজ বোঝাই করে শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়ে দেয়। তাদের একটা বিরাট অংশকে প্রত্যাবাসনের সুযোগ দেবার ফলে পরবর্তীকালে তারা নতুন রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি পক প্রণালী (Palk Straits)-এর দুটি ছোট্ট দ্বীপের দাবিও পরিত্যাগ করেন শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ।

ভারতের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণের অভিযোগ নেপাল এবং বাংলাদেশেও শোনা যায়। ভারত সে রকম একটি রাষ্ট্র যেখানে সহজে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে গলাবাজির শীকার হয়ে তাকে অন্যের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। নেপালের উদাহরণ নেয়া যায়। এই অভিযোগের ফলে কাঠমুন্ডুতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরোধিতা থেকে জনতা মুখ ফিরিয়ে নেয়

www.pathagar.com

এবং গণতান্ত্রিক বিরোধীদলের চাপ কিছুটা হ্রাস পায়। নেপালীদের রাজধানীতে বিক্ষুব্ধ মানুষের এই বিস্ফোরণের প্রসঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—১৯৭৪-এ সিকিমকে বেআইনীভাবে ভারতের সঙ্গে সংযোজিত করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র গিরি-রাজ্যটি'র পদ-মর্যাদার বিষয়টি বৃটিশ সরকারের এই উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ই স্পষ্ট ভাবে স্থির করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, "সিকিম অন্যতম রাজসিক রাষ্ট্র যার ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার ভেতরে থাকবার সম্মতি আছে।" পরবর্তীকালে লিনলিথগো এবং ওয়াভেলের রাজপ্রতিনিধিত্বকালীন সময়ে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব স্যার ওলাফ ক্যারো ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৪-এ 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'এ প্রকাশিত একটি চিঠিতে তাঁর নিজস্ব সাক্ষ্যসহ বিষয়টি সমর্থন করেন। কিন্তু পিকিং এ বিষয়টি এবং তিব্বতের ঔপনিবেশিতা স্বীকার করে না। এবং কিছু আমেরিকান লেজুড়বৃত্তিধারীরা স্বচ্ছন্দে অবিরতভাবে বিষয়টি রটনা করতে থাকে নেপালের ওপর তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং সমান গুরুত্বের সাথে ভারতকে অস্বস্তির ভেতর এবং মানসিক চাপে রাখার জন্যে।

ইন্দিরা গান্ধী কঠিন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। কোন সন্দেহ নেই যে নেপাল সরকার ভেবেছিল যে ভারত চোখ রাঙ্গাবে না। ইন্দিরা সরকার পুরনো প্রতিশ্রুতি পালন করতে সম্মানের সাথে ১৯৭০-এ ভূটানকে ইউনাইটেড নেশনস্-এর সদস্য করে নেবার জন্য প্রস্তাব করে। বাংলাদেশের সাথেও ইন্দিরা গান্ধী এই ধরনের বিতর্কের ক্ষেত্রে, যেমন গঙ্গার জল বন্টন, আসাম থেকে বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতে, ভারত সীমান্ত জুড়ে সীমানা দেয়াল নির্মাণ এবং বঙ্গোপসাগরে উত্থিত দ্বীপের মালিকানার প্রশ্নে দৃঢ়, দায়িত্বশীল এবং শিষ্টাচারী ছিলেন। তিনি কখনো মাও পন্থী-মোল্লাদের মৈত্রীকে ভয় পাননি। যাদের একটি কট্টর বামপন্থী, অপরটি কট্টর ডানপন্থী এবং দুটো দলই ঢাকা সরকারের ওপর ভারত-বিরোধী প্রভাব প্রয়োগে করতে সদা সচেষ্ট। তিনি কেবল বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে যাদের প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হল ভারতকে বিদ্রুপ করা, তাদের কোন রকম প্রাধান্য তিনি দেবেন না। শ্রীলঙ্কা, নেপাল এবং বাংলাদেশ যথাক্রমে আফগানিস্তান, কম্পুচিয়া এবং কাশ্মীরের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল যা ভারতের বিরোধী। ভারত তাদের অস্থিরও করেনি, আক্রমণও করেনি। ইন্দিরা গান্ধীর দর্শন ছিল আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, যুদ্ধংদেহী মনোভাব নয়।

সুতরাং ইন্দিরা গান্ধীর বৈদেশিক নীতির প্রধান স্তম্ভ ছিল জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন। বিষয়টির পরিকল্পনা করেছিলেন জওহরলাল নেহেরু। এই জোটের ভেতর দিয়ে তিনি ঠাণ্ডা-লড়াই-এর নিষ্ফলা বিস্তার এবং সঙ্গে সঙ্গে

www.pathagar.com

পারমানবিক ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণ খুঁজেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এ ধারণা গ্রহণ করেছিলেন জোসিপ ব্রজ টিটো এবং আবদাল গামাল নাসের। পরবর্তী দুই দশকেরও বেশী সময় ধরে জোট-নিরপেক্ষ জাতিগুলোর যৌথ শরীর চারাগাছ থেকে লতিয়ে বেড়ে উঠে পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। দলটি'র সদস্য সংখ্যা ১০০'ও বেশী। কিন্তু মূলতঃ দেখতে একটি নমনীয় আন্দোলন হলেও, এখানে বিচিত্র রকমের হাজারো মতামতের সমন্বয় ঘটে; অথচ মৌলিক প্রশ্নগুলোতে যুথবদ্ধ থাকে তারা।

জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলোর উদ্দেশ্য হলো পারমানবিক যুদ্ধের কালো ছায়া থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করা; পূর্ব-পশ্চিম বিচ্ছিন্নতায় সহযোগিতার সেতু বন্ধন; ব্যবসা এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিনিময়ের মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া; বিশ্ব-অর্থনীতিতে ধনী উত্তর এবং দরিদ্র দক্ষিণের ভেতর ভারসাম্যহীনতা কমিয়ে আনা; প্যালেস্টাইন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মত অঞ্চলের চাপা উত্তেজনা হ্রাস করা। তারা প্রথমতঃ প্যালেষ্টাইনীদের নিজস্ব আবাসভূমিতে বসতির ব্যবস্থা করা এবং দ্বিতীয়তঃ বর্ণবৈষম্যনীতির ঘৃণা ও বিভীষিকা নিশ্চিহ্ন করার বিষয়গুলিতে একমত হয়। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন সদস্য দেশগুলোর জন্যে এমন একটা জায়গা যেখানে তারা পরস্পর আলোচনা করতে পারে এবং নিজস্ব মত প্রকাশ করতে পারে। যদি প্রয়োজন হয়, সদস্য দেশগুলোর ভেতর ঝগড়া ঝাটি বা সংঘাত এড়াতে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ দিতে পারে। ইরাক-ইরান যুদ্ধ যার একটি দুঃখজনক উদাহরণ।

সামগ্রিক ভাবে এই আন্দোলনের মেজাজ কখনোই যুদ্ধংদেহী ছিল না। দিল্লীতে ১৯৮৩'র মার্চে অনুষ্ঠিত জোট-নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা ছিল সবারই ইচ্ছের প্রতিফলন যাতে করে আমাদের এই বিভক্ত পৃথিবীটাকে এক রাখার প্রচেষ্টায় সব রকম উপায়ে সংলাপ চালিয়ে যাওয়া যায়। এ পদে তাঁকে মনোনীত করা হয়েছিল এ কারণে যে, আন্তর্জাতিকভাবে সুবিধা-বঞ্চিত গোষ্ঠিগুলোর আশা-আকাঙ্খা এবং দুঃখ-দুর্দশার কথাসহ সমগ্র বিশ্বের মানব-মানবীর জন্যে বন্ধুত্ব এবং শান্তির বিস্তীর্ণ বার্তা জানাবার মত স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর তাঁর ছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের ছোট্ট পৃথিবীটা একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের আওতাধীন অতি সাধারণ গ্রহ। তবু দুটো বিস্ময়কর জিনিসের সে ধারক, জীবন এবং মন। যা থেকে অন্যান্য বিস্ময়গুলোর উৎপত্তি। আজ এ বিশ্ব তার নিজেরই সৃষ্টি এবং আকাঙ্খার কারণে ধ্বংসের মুখোমুখি।"

যাহোক, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও এই জোট-নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

অধিবেশনের একটি সমস্যার বিষয় ছিল। আসামে প্রচণ্ড লাগামহীন সহিংসতা দেখা যচ্ছিল। ১৯৮৩'র ফেব্রুয়ারী মাসে স্থানীয় আসামদেশীয় এবং আদিবাসীরা মিলে প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙ্গালীদের বিরাট একটা অংশকে নির্বিচারে হত্যা করে। শেষপর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দাড়ায় ৩,০০০; হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।

এই অবস্থাটা জনতা সরকারের আমলেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বলার মত খুব সামান্যই করেছে তারা। সে সময় সব সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীরা আক্রমণের শিকার হয়েছিল, যারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের অধিবাসী, যারা সাবলীলভাবে আসামের ভাষা বলতে পারে। ১৯৮৩'র শুরু থেকেই আলোড়নটা দানা বেঁধে উঠেছিল। রাজধানীতে তখন ঘোষণা করা হয়েছিল যে বিধানসভা এবং সরকার গঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে হাল নাগাদ নির্বাচনী তালিকা অনুযায়ী। দিল্লী থেকে সংসদীয় কাঠামোর বিষয়ে রাষ্ট্রপতির আইনে তেমনটি সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আসামের নেতারা অনেক আগে থেকেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ছিল। তারা বার বার করে বলেছিল যে বাংলাদেশ থেকে আগত ক্রমবর্ধমান অবৈধ জনগোষ্ঠী আসামের নৃতাত্বিক এবং ভাষাতাত্বিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলছে। সুতরাং নতুন করে নির্বাচনী তালিকা প্রস্তুত করতে হবে, যেখানে কেবলমাত্র প্রকৃত বাসিন্দারা তালিকাভুক্ত হবে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দিতে হবে।

এই সমস্যার অবশ্যই একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে, যা বুঝতে বৃটিশ-শাসনের সময়ে ফিরে যেতে হবে। আসাম সে সময় চা, দারুচিনি এবং তেলসমৃদ্ধ ছিল, জনসংখ্যা ছিল কম। সেখানকার সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন ছিল সব ধরনের দক্ষ শ্রমিকের। সুতরাং বাঙ্গালীরা, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙ্গালীরা বন্যার স্রোতের মত আসামে গেল এবং দখল নিল। তারা ছিল অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত শ্রেণী। সে কারণে প্রশাসনের উচ্চ এবং মধ্য মানের দায়িত্বের স্তর তারা অধিকার করে নিল। সেখানে উকিল, ডাক্তার এবং অন্য পেশার মানুষদেরও একটা অন্তঃপ্রবাহ ছিল। বাংলা এবং আসামের ভাষা অনেকটা এক রকম এবং আসামের উপর বাঙ্গালী সংস্কৃতির আধিপত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব হস্তান্তরের কারণে আসামের অধিবাসীরা ঈর্ষা এবং অপমানবোধে আক্রান্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৬০ সালেও আসামে একবার বাঙ্গালী-বিরোধী সহিংসতা ঘটেছিল।

এর সাথে পূর্ব বাংলা হতে অবিরত অনুপ্রবেশের বিষয়টি যুক্ত হয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা দাড়ায়। অনুপ্রবেশকারীরা অধিকাংশ ভূমিহীন কৃষক জীবিকার

www.pathagar.com

খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। আসামের অনেক অধিবাসীই প্রাথমিকভাবে বৃটিশ-রাজের আমলে সস্তায় শ্রমিক পাবার কারণে তাদের স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই হার বহু গুণ বেড়ে যায়। তাদের আসা বন্ধ করবার জন্য কোন ব্যবস্থাই তখন গ্রহণ করা হয়নি। এবং তারা স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেসের ভোট-ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। ১৯৭১-এ পূর্ব বাংলার সঙ্কটে ইয়াহিয়া খানের দমননীতির পরিণামে ভারতের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে শরণার্থীদের প্রবাহ সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে যায়। যখন নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশে শক্তি ফিরে আসে তখনও তাদের জন্য বিবর্ণ ভবিষ্যৎ ছাড়া কোন আশার আলো ছিল না। সুতরাং তারপরও শরণার্থির স্রোত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাচন কমিশন আবিষ্কার করে যে কোন কোন জেলায় বাঙ্গালীরা সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়েছে। প্রচণ্ড শোরগোল শুরু হয় এবং ঐ সব "বিদেশী"-দের দেশ থেকে বহিষ্কারের দাবি ওঠে, তেমনি ভাবেই বিষয়টি তারা বর্ণনা করে।

ইন্দিরা গান্ধী আসামদেশীয়দের দাবির গুরুত্ব অনুধাবন করেন। এলাকাটির গুরুত্ব ছিল বাসস্থান নির্ণয় সংক্রান্ত। তাঁর মত ছিল এই যে কেবলমাত্র ১৯৭১-এর পরে আগতদের নির্বাচন তালিকা থেকে বাদ দেয়া উচিত। আসামের আন্দোলনকারীদের প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত সময় ছিল ১৯৪৮, পরবর্তীকালে তা ১৯৬০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়, এর বাইরে অন্য কিছু মেনে নিতে তারা অস্বীকার করে।

মূলতঃ সেটা ছিল তখন একটা মানবিক ইস্যু। ভারতের ক্ষমতা ছিল দশ লক্ষ মানুষকে দেশ থেকে বের করে দেবার। যেমনটি নাইজেরিয়া করেছিল ঘানা'র অধিবাসীদের সাথে। কিন্তু দুঃখ-দুর্দশা এত মর্মান্তিক ছিল যে তিনি সঠিকভাবেই এই ধরনের কাজকর্ম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

যেহেতু কোন পক্ষই ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিল না, সেহেতু একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। পরিণামে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায় এবং অভিবাসী-বিরোধী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান মুসলিম-বিরোধী (বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী যেহেতু মুসলমান) অসন্তোষ প্রচণ্ডভাবে আসামের মুসলমানদের ওপর গিয়ে পড়ে, যা সমর্থন করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু অধিকাংশ বিরোধী দলগুলো উদ্যোগ নিল এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার। ডানপন্থী হিন্দু জনসংঘ নির্বাচন স্থগিত রাখার সমালোচনা করে এবং বলে যে এই আদেশের পেছনে বড় লেনদেন আছে। একটি দল সন্দেহ করে যে, "বিদেশী-বিরোধী" আন্তরিকতার প্রমাণ। অন্যদিকে মুসলমান সংগঠনগুলো এই সত্য অগ্রাহ্য করতে মনস্থ করে যে বস্তুত বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীদের আগমণের ফলেই প্রায় অপ্রতিরোধ্য এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

আরও কিছু অপেক্ষাকৃত কম সহিংস এলাকা ছিল। নাম করা যায় দক্ষিণের কর্নাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের। রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এই সব জায়গা থেকে স্রেফ বিতাড়িত হয়েছেন। কর্নাটকে জনতা জোটের অধীনে নেতৃত্বে ছিলেন রামকৃষ্ণ হেগ্‌দে, আর অভিনেতা-রাজনীতিবিদ এন. টি. রামা রাও। অন্ধ্র প্রদেশে মি. রামা রাও তাঁর দল তেলেগু দেশম পার্টির নেতা হিসেবে সরকার প্রধান ছিলেন।

সংগঠনের ভেতরে এবং স্থানীয় নেতৃত্বে সমতা না থাকার ফলে এককালে ক্ষমতাশালী কংগ্রেসের অবক্ষয় এবং পতনের কারণগুলো প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। পার্টি-যন্ত্রে জন্ম নিয়েছিল দুর্নীতি এবং দুর্বলতা। চলছিল 'তামানি হল' (Tammani Hall) নীতিতে। যার নির্মম বিবেকহীন কর্মকান্ড জনগণের ঘৃণার উদ্রেক করেছিল।

এই অসন্তোষের প্রেক্ষিতে সুবিধাভোগী এন.টি. রামা রাও ছিলেন সহজাত অভিনেতা। রূপালী পর্দার সুদক্ষ ভগবান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। বাস্তব জীবনেও তিনি তেমনটি হবার জন্য দৃঢ়ভাবে ব্রতী। এতে করে সাধারণভাবে রাজনীতির কুটিল অবস্থা সূচিত হল। এবং আগে থেকে তৈরি করা এমন সব কথাবার্তা বলা হতে লাগল যে ভূতপূর্ব শাসক দলটি ভেতরের চক্রান্তকারীদের একটা আখড়ায় পরিণত হল। অন্ধ্র প্রদেশে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় ফিরে যাবার জন্য গৃহীত এই সব নোংরা কৌশল মাঠে মারা যায় যেহেতু জনগণ ক্রোধ এবং প্রবল বিরক্তি নিয়ে রাজপথে ছিল। গণতন্ত্রের বিধিমালাকে তারা এমন নির্লজ্জের মত অবজ্ঞা করেছিল যে তাদের জন্য পাওনা ছিল কেবল অপমান। ফলে জনগণের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রামা রাও'র প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছিল তার প্রতিকার হল, তিনি আবারও মুখ্য মন্ত্রী পদে বৃত হলেন। গভর্নর মি: রামলাল যান্ত্রিক ভাবে তার বরখাস্তের প্রক্রিয়ার কাছে আত্মসমর্পন করলেন। সুবিচার পাওয়া গেল বলে মনে হল।

যাহোক, কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের বিষয় দু'টিতে আলাদা রকমের সাম্প্রদায়িক মাত্রা ছিল, যা কর্নাটক এবং অন্ধ্র প্রদেশে ছিল না। এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা নিজেরই যৌক্তিক ভাবে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। নইলে ভারতের অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটবে। একই সাথে শেষ হয়ে যাবে ভারতীয় গণতন্ত্র। জাতীয় জীবন-ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে অন্যান্যদের অস্তিত্বের প্রশ্নে জামিনদার হচ্ছে এই বিষয় দু'টি।

জাতীয় অধিবেশনে কাশ্মীরের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের নেতৃত্বদানকারী ফারুক আবদুল্লাহ তাঁর ইসলামী মৌলবাদী আচরণ দ্বারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেন। ১৯৮৩'র অক্টোবর মাসে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে এক দল বিদ্বেষী মানুষ ভারতীয় খেলোয়াড়দের গালাগাল ও অপমান করে এবং তাদের ওপর হামলা চালায় মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ'র উপস্থিতিতে। বিষয়টা অবশ্যই ভারতকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে স্লোগান এবং পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন সে আঘাতে অপমানের বিষ ঢেলে দেয়। কাশ্মীরের অবস্থানগত কারণের জন্যে জাতির কাছে তা একটা মুখ্য উদ্বিগ্নতার বিষয়। অনেক ভারতীয় রক্ত ঝরেছে কাশ্মীরের নিরাপত্তা রক্ষায়। সেখানেও ভারতের সাথে সংযুক্তির পক্ষে তাদের প্রবল সমর্থনের ফলে রাজ্যের নির্বাচনে কাশ্মীর কংগ্রেস আশ্চর্য্যজনকভাবে প্রচুর আসনে বিজয়ী হয়। ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের একটি অংশ আবদুল্লাহ'র অদূরদর্শী নির্বাচনী কৌশলের বিরোধিতা করে। এই ধরনের শক্তির উপস্থিতি ছাড়া ১৯৪৭-৪৮-এ পাকিস্তানী অর্থায়নপুষ্ট উপজাতি হামলা এবং ১৯৬৫-তে সীমান্তে গেরিলা হামলাতে কাশ্মীর টিকে থাকতে পারত না।

যাহোক, জামাত ইসলামী নেতৃবৃন্দ এবং মৌলভী ফারুকের নির্বাচনী ইস্তাহারে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আহ্বানে অমঙ্গলের ইঙ্গিত ছিল। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সপ্তদশ শতকে এ রকম একটি রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতার ধ্বংস নিশ্চিত করেছিলেন। সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে কেউ তাকে অনুসরণ করে উত্তরসূরী হবেন সে সুযোগ ছিল না। এই ধরনের বিপদ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন আবদুল্লাহকে সন্দেহজনক পদ্ধতিতে সরিয়ে দেবার চেয়ে ভাল ছিল রাজনৈতিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করা।

স্বাধীনতার পর ভারতের ইতিহাসে সব চেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে পাঞ্জাবে। এ সমস্যার পেছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করেছিল; শিখ পরিচয়-সঙ্কট, রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা, হিন্দু-শিখ সম্পর্ক, শিখদের মধ্যে দলাদলিপূর্ণ দ্বন্দ্ব, আকালী দল এবং কংগ্রেস-এর কৌশলী মানসিকতা, প্রাদেশিক সায়ত্তশাসন বনাম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষিতে সবুজ-বিপ্লবের ফলে রাজ্যটি ভারতের রুটির ঝুড়িতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু শ্রেণী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শিখদের মধ্যে জাট এবং জাট নয়, এমনদের সংঘাতও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আকালী দল ১৯২০-এ প্রসিদ্ধি লাভ করে শিখ ধর্মের উন্নয়নকামী একটি দল হিসেবে। কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমানের সাথে কলহ করার পরিণামে দলটি একটি ধর্মীয় উন্মাদের শকটে পরিণত হয়। দুর্ভাগ্য এখানে যে এরা কেউ আত্মিকশক্তির উন্নয়ন দ্বারা জয় করবার বিষয়ে বিশ্বাসী ছিল না। শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

জয়ী হল আক্রমণাত্মক মানসিকতা। ফলে পাঞ্জাবে পরিচয়ের ব্যাপারটি অগ্রাহ্য হল এবং গোটা বিষয়টি আলাদা একটা বিশ্বাসে পরিবর্তিত হল। এর একটা ফল হল ১৯৪৭-এর দেশ ভাগ এবং তার সাথে সাথে আসা ব্যাপক ধ্বংস। রাজধানী লাহোরসহ প্রদেশের পশ্চিম অর্ধাংশ পাকিস্তানের কাছে হারাতে হল। লাহোর ছিল শিখ শক্তির কেন্দ্র। এটা সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের জন্য ছিল সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গছেদন। এর ফলে একটি গর্বিত সংখ্যালঘু অংশের মানুষের পরিচয় সঙ্কট তীব্রতর হল। এ প্রেক্ষিতে বিশাল হিন্দু অঞ্চল থেকে তারা সম্ভাব্য একাত্মতা প্রত্যাশা করেছিল।

ভারতের পাঞ্জাব তবু ১৯৬৬-তে আবারও ভাগ হল আকালী দলের আন্দোলনের কারণে। আকালি দল তখন সিকিমের মতবাদের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে, বিশেষ করে জাট শিখ চাষীদের সমৃদ্ধির জন্যে। এই প্রচারণা শক্তি অর্জন করে অধিকাংশ পাঞ্জাবী হিন্দুর বোকামী ও অদূরদর্শিতা থেকে। পাঞ্জাবী সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে অতীতে হিন্দু, মুসলমান এবং শিখরা মিলিতভাবে অবদান রেখেছিল। এখন এমন হল যে এর উত্তরাধিকার কেবল মাত্র শিখদের।

আকালিরা এর সুযোগ গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারকে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বোঝাতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের হতাশা বাড়তে থাকে। তারা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে, ১৯৭৭ ছাড়া, সাফল্য পেতে ব্যর্থ হয়। তারা আশা করেছিল যে কেন্দ্রের ওপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তারা পাঞ্জাবে স্বায়ত্তশাসন আদায় করবে। তারা আরো আশা করেছিল ধর্মীয় বাতাবরণে গঠিত একটি শাসন-যন্ত্র দ্বারা তা নিশ্চিত করা হবে এবং তার সাথে যুক্ত থাকবে আকালি দলের অধিকাংশরা। ১৯৭৩-এ আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রথম বারের মত সমন্বিতভাবে আকালি দলের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়। তাতে অভ্যন্তরীন এবং বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে এমন দাবি করা হয় যে, যদি তা গৃহীত হত, তাহলে পাঞ্জাব বিচ্ছিন্নতার পথে অনেক দূর এগিয়ে যেত। বস্তুত স্বঘোষিত খালিস্তানী নেতা গঙ্গা সিং ধীলন তাৎক্ষণিকভাবেই এর সত্যতা স্বীকার করেন।

এই রকম সমস্যাসঙ্কুল প্রেক্ষাপটের কারণে পাঞ্জাবের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতায় আক্রান্ত হয়। তবু শিখ এবং হিন্দুরা গভীর ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ। কিন্তু বাম বা দক্ষিণ কোন দলই, আকালি, কংগ্রেস, অথবা এমন কী কম্যুনিস্ট পার্টিও সাম্প্রদায়িকতার উপরে উঠে নির্বাচনের সফলতার সন্ধান করেনি। সম্ভবতঃ একমাত্র রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দরবারা সিং-কে, যিনি এই প্রবাহ ঠেকাবার জন্যে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, কৌশলে সরিয়ে দেয়া হয় কারণ; এই সাম্প্রদায়িক খেলা খেলতে তিনি সম্মত হননি।

১৯৬৬-তে কর্মভার গ্রহণের এক বছরের ভেতর ইন্দিরা গান্ধী আকালি দলের দাবি অনুযায়ী পাঞ্জাবী ভাষা-ভাষী'র আলাদা রাজ্যের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। যুক্তিযুক্তভাবেই প্রতিবেশী হরিয়ানার সাথে ভাগাভাগিতে না গিয়ে নতুন রাজ্যটিকে রাজধানী চণ্ডীগড়ের একচ্ছত্র অধিকারী হওয়ার অনুমতি দেয়া তাঁর উচিত ছিল। সম্ভবতঃ তিনি কৌশলগত ভুল এখানে করেন। যা'হোক ১৯৮১ এবং ১৯৮৪'র মধ্যে চরমপন্থী শিখদের খুন-জখমের অপরাধের কাছে নদীর জলের ভাগাভাগি এবং আন্ত-রাজ্যে সীমানা চিহ্নিত করার মত বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আকালি নেতৃত্বের সাথে আলাপ-আলোচনার নিয়ন্ত্রণ পর্দার-পেছনের সহিংসতার জন্যে দায়ী মানুষগুলোর হাতে চলে যাওয়ায় বিষয়টি ক্রমান্বয়ে "পোকার" খেলায় পরিণত হয়। আকালিরা ক্রমাগত তাদের অবস্থান বদলাতে থাকে। এমন কী সম্মেলন কক্ষে বিরোধী প্রতিনিধিদের প্রবেশের ব্যাপারেও তারা আপত্তি তোলে। ১৯৮৪'র ফেব্রুয়ারী মাসে শেষবারের মত আলোচনা হয়, যখন আকালি প্রতিনিধিরা শুরুর পরের দিনই সভাস্থল ত্যাগ করে।

সম্প্রদায় হিসেবে শিখরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হয়েছে। চরিত্রের স্থিতিস্থাপকতা এবং কঠিন শ্রম তাদের সমৃদ্ধির চাবিকাঠি এবং এ সব কারণে ভারতে তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব, যার উৎকর্ষতা অসীম। যাহোক দুঃখজনক সত্যি এই যে রনজিৎ সিং, যিনি ছিলেন পুরনো দিনের অতি আধুনিক একজন মানুষ, ১৯৮৩ সনে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত তারা মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী সমৃদ্ধ একজন নেতা তৈরি করতে পারেনি। চরম সঙ্কটপূর্ণ দিনগুলোতে আকালি নেতাদের বোধশক্তির অভাব এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি করতে না পারার ফলেই স্বর্ণ মন্দিরে প্রচণ্ড আক্রমণের মত ঘটনা ঘটে।

রাসপুটিন এবং আয়াতউল্লাহ খোমেনী'র বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের সংমিশ্রণের মাধ্যমে গঠিত মনোভাবের অধিকারী ও দাম্ভিক জার্নাইল সিং ভিনড্র্যানওয়ালে আর তার সহযোগীরা পবিত্র প্রার্থনার ক্ষেত্রকে হত্যার ময়দানে পরিণত করে। তাদের অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার ভারতের অস্তিত্বের জন্যে হুমকী হয়ে দাঁড়ায়। তারা সেই কাজটি করতে উদ্যত হয়েছিল, যে কাজটি ১৯৭১-এ পাকিস্তান, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র মিলিতভাবেও পারেনি। সেটি হল

www.pathagar.com

ভারতের ঐক্য এবং অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের ধ্বংস সাধন। ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণ মন্দিরে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেবার সময় খুব ভাল ভাবেই জানতেন, তাঁর জনগণের জন্যে তা কতখানি ঝুঁকিপূর্ণ হবে। এবং একই সাথে জানতেন, তিনি যদি তা' না করেন তা'হলে ভারতের পরিণতি কী হবে। আব্রাহাম লিঙ্কনের মতই তিনি বিশ্বাসঘাতক বুলেটের আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করেছেন; তাঁর মতই তিনি দেশের ঐক্য রক্ষা করেছেন।

কয়েকজন মর্মাহত শিখ পত্রলেখক আমেরিকা এবং বৃটিশ সংবাদ মাধ্যমে তাদের দিল্লীর প্রতি বৈরীতার বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন এই প্রশ্ন রেখে যে ভ্যাটিকানে হামলা হলে রোমান ক্যাথলিকরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাত? উত্তর অবশ্যই এই হবে যে, ভ্যাটিকান যদি কখনো বিদ্রোহ বা হত্যার অভয়স্থল হবার জন্য অস্ত্রের ডিপোতে পরিণত হতো এবং যে অস্ত্র সেখানে পাওয়া যেতো তাতে যদি চিহ্ন পাওয়া যেত পশ্চিমের একটি শত্রু দেশের, তা'হলে ন্যাটোর (NATO) ট্যাঙ্কবাহিনী আক্রমণ পরিচালনার জন্য এগিয়ে যেতো।

তৎসত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধী বিষয়টি অনুধাবন করার মত অভিজ্ঞ এবং যথেষ্ট মেধাবী ছিলেন যে এটা হচ্ছে একটা আরোগ্যকর পদক্ষেপ, পাল্টাপাল্টি গৃহীত কোন ব্যবস্থা নয়, যা সুখী ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। ইতিহাসের শিক্ষা যদিও প্রায়ই তিক্তকর, তবুও তা যথেষ্ট পরিমাণে সাধারণজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। ভারতের বিষয়ে স্ববিরোধী সত্যিটা এইখানে যে, এর রাজনৈতিক সমস্যার সময়েও অর্থনীতি, শিল্প এবং কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যথারীতি চলমান থাকে।

গম-এর সবুজ-বিপ্লব শস্যক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি আনে। প্রাথমিকভাবে তা' কেন্দ্রীভূত ছিল উত্তরাঞ্চলের রাজ্যসমূহ—পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে, যা এখন উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের অনুন্নত এলাকা সমূহেও ছড়িয়ে পড়েছে। আশা করা যায় যে পশ্চিম বাংলা এবং অন্যান্য জায়গাতেও উন্নততর সার সরবরাহ এবং সেচের মাধ্যমে জল-প্রবাহের সম্পূরক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ধান উৎপাদনের নতুন প্রসারণ সম্ভব; তা হতে পারলে আশা করা যায় যে ভারত প্রাচুর্য্যের পথে এগিয়ে যেতে বড় একটা পদক্ষেপ নিতে পারবে।

যাহোক, ইতিমধ্যেই ভারতের অর্জন অসাধারণ। ১৯৮৪-তে শস্যক্ষেত্রে ভারতের উৎপাদন ছিল রেকর্ড পরিমাণ। মজুত ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। ১৯৬৬-তে ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন, দেশে তখন প্রবল খাদ্য-সঙ্কট চলছে। বিদেশী পর্যবেক্ষকরা লিখলেন যে দাতাদের সহযোগিতার উদার হস্ত থেকে দূরে ভিক্ষার ঝুড়িটি বঞ্চিত হবে। এটাও

www.pathagar.com

স্বীকার্য্য যে এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা এখনো পর্যন্ত অনেকখানি ক্ষীণতনু, যেহেতু তা নির্ভর করে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের মেজাজ-মর্জির ওপর। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে উন্নতি হয়েছে, তাতে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী সুনিশ্চিত ভাবে দেশের উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক শক্তিকে মজবুত করবার উপায় খুঁজছিলেন। ১৯৮২-তে তিনি আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) থেকে ৫ শত কোটি (৫ বিলিয়ন) ডলার ঋণ গ্রহণ করেন সাময়িকভাবে বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির কারণে। কিন্তু বাম-দল বিশ্রী সঙ্কটের সৃষ্টি করল। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার বাম-সরকারের মার্কসপন্থী অর্থমন্ত্রী বলছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারতের ভবিষ্যৎ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাছে বন্ধক রেখেছেন। কোপারনিকাস যুগের পর মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের টলেমীর (Ptolemy) সাথে মল্লযুদ্ধের মত। তিনি এবং তার সহকর্মীরা ভুল করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী ঋণের একটি অংশমাত্র নিয়েছিলেন এবং দু'বছরের মধ্যে তা শোধ করে দেয়া হয়। ফলে সমালোচকরা তাদের স্থির দৃষ্টি অন্য দিকে সরাতে বাধ্য হন।

শিল্পক্ষেত্রেও সাফল্য ছিল চমৎকার। এই খাতেও ভারতের একটি সমন্বিত ভিত্তি আছে। বিশ্বের প্রথম দশটি শিল্প-শক্তির একটি ভারত। প্রথম শিল্প বিপ্লব লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ইন্দিরা গান্ধী সচেতনভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে দ্বিতীয়বার সে রকম তিনি হতে দেবেন না। সুতরাং তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক্স এবং কম্পিউটারের মত আধুনিক প্রযুক্তিগুলোর উন্নয়ন করবার জন্য সাধ্য মত তিনি সব করলেন। সে কারণে একই সাথে মাধ্যমিক এবং উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বর্হিবিশ্বের সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাথে ভারত সংস্পর্শ রাখতে সক্ষম হল।

যদিও ইন্দিরা গান্ধীর শিক্ষাদীক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের সুপ্ত ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টায় সরকারের সহযোগী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে বাধ্য।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একই সাথে তিনি আনবিক শক্তি, ইলেক্ট্রনিক্স, সমুদ্র উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও মহাকাশ দফতরগুলিরও মন্ত্রী এবং বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই সব ক'টি দফতরের প্রত্যেকটির উন্নয়নের পেছনে তাঁর অধিকার তিনি দৃঢ় ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। দেশের সেরা বিজ্ঞানীদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁদের থেকে কয়েকজনকে তিনি ভারতের পরিকল্পনা কমিশনে গ্রহণ করেছিলেন। এবং অন্যদেরও জাতীয় দুর্লভ উৎসগুলোর ওপরে দাবি থাকা সত্ত্বেও ভারতের বিজ্ঞান কখনও অর্থ তহবিলের খরায় ভোগেনি।

www.pathagar.com

পরমানু ও মহাকাশ প্রযুক্তি এবং মহাসমুদ্রবিদ্যায় ভারত অনেক দূর এগিয়েছে। এন্টার্কটিকায় সফল অভিযান তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইন্দিরা গান্ধীর সহযোগিতা এবং উৎসাহের জন্য এ অভিযান তাঁর কাছে ভীষণ ভাবে ঋণী। কেবল বিজ্ঞানই পারে ভারতীয় জনগণকে তাদের জীবন-ব্যাপী দারিদ্র্য এবং পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত করতে, এই গভীর এবং দৃঢ় বিশ্বাস তার ভেতর থেকে উৎসারিত ছিল। এ বিষয়ে তাঁর শেষ বার্তা 'টেকনোলজি পলিসি স্টেটমেন্ট'-এ উদ্ধৃত আছে যা বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। তিনি বলেন, "সব কিছুর ওপরে সবাই আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হবেন এবং জাতীয় সামর্থ্যে গর্বিত থাকবেন। ভারতের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি অবশ্যই আমাদের জনগণের সৃষ্টিশীল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে এবং আমাদের স্বপ্নের ভারত গড়তে সাহায্য করবে।"

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর জীবনের ধারা অবিস্মরনীয় বিজয় এবং গভীর দুঃখে মোড়া ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন অজস্র সুখ তেমন গভীর দুঃখ ছিল। তাঁর শেষ বছরগুলোতে তাঁর পৌত্রপুত্রীরা ছিল তার আনন্দ, কিন্তু ১৯৮০-তে বিমান দুর্ঘটনার পুত্র সঞ্জয়ের অসময়ে মৃত্যু ছিল একটি মর্মান্তিক এবং কঠিন আঘাত। সঞ্জয়ের সহধর্মিনী মেনকার সাথে বিচ্ছেদ এবং সংবাদপত্রে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে তার অরুচিকর ক্রোধান্ধ কথাবার্তা ছিল বিশেষভাবে কষ্টকর।

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী কখনো তাঁর স্থৈর্য্য, মাধুর্য্য এবং আকর্ষণ হারাননি। মাইকেল ফুট তার এই গুণাবলী সম্পর্কে লিখেছেন, "ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে কিছু বুঝিয়ে বলা কঠিন। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্য তিনি ছিলেন সব চাইতে কম দাম্ভিক, সব চেয়ে কম আত্মবাদী। প্রায় অন্যরকম একটা অস্তিত্ব। একজন নির্মম স্বেচ্ছাচারী হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করার পর তাঁর সাথে দেখা করা ছিল একটা চমকপ্রদ ব্যাপার। এই সাক্ষাতকারে জানা গেল, কোন মন্ত্রে তিনি তাঁর সহচর এবং মন্ত্রী সভার সদস্যদের বশ করে রেখেছেন। তিনি তাঁর পরিবারকে ভালবাসতেন। এবং অবশ্যই একজন মা'য়ের তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত হতেন, যখন দেখতেন তাদের বিদ্রুপ করা হচ্ছে। তিনি যেমনটি বিশ্বাস করতেন যে, মানহানিকর। কিন্তু তারপরও তিনি প্রায়ই তাদের সাহস দিতেন বা কঠিন শাস্তি প্রদান করতেন, দুটোই একইভাবে তাঁর চমৎকার স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গীতে।"

আমেরিকান লেখক ডরোথি নরম্যান ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাঁর ৩৫ বছরের বন্ধুত্বের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি তাঁর "সংবেদনশীলতা এবং চমৎকারীত্ব" সম্পর্কে বলেন, তাঁর আগ্রহ "বনেদী চিত্রকলা, সাহিত্য,

www.pathagar.com

সঙ্গীত”-এ, বিশেষ করে বাখ্ (Bach)। “তিনি পছন্দ করতেন সঙ্গীত এবং কবিতা” এবং ছিলেন “মনে প্রাণে একজন কবি। তিনি কখনো ক্ষমতার পিয়াসী ছিলেন না। সব সময় শান্তির অন্বেষা করতেন। আমি যতটা জানি, তিনি ছিলেন সব চেয়ে ভুল-বোঝা একজন নেতা।”

তাঁদের দু'জনের মধ্যে মতভেদ ছিল। ডরোথী নরমান লিখেছেন, “জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে (আমি) কথা বলেছি। নাগরিক স্বাধীনতা বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের কোন ক্ষতি হয়নি তাতে। যুক্তিযুক্ত সমালোচনা গ্রহণের জন্য তাঁর হৃদয় সব সময় উন্মুক্ত থাকত। তিনি জরুরী অবস্থা তুলে নিলেন আর বললেন, আর কখনো এমনটি করবেন না। আমি অনেক দূরে ছিলাম। আমার কোন প্রভাব তার ওপর ছিল না। কিন্তু পরস্পরের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ সৎ ছিলাম।”

বৃটেনের কেউ জানে না যে ইন্দিরা গান্ধীর ঠিক একই রকম অথবা একই আন্তরিক সম্পর্ক ছিল চলচ্চিত্র ইতিহাসবেত্তা এবং সমালোচক মারী সিটন-এর (Marie Seton) সাথে। ব্যক্তিগত বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও ইন্দিরা গান্ধী কখনো লন্ডন ভ্রমণ করেননি তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে না নিয়ে, সে বাজার করতে হোক অথবা হোক থিয়েটার দেখার সময়।

মারী সিটন তাঁর দুই ছেলে রাজিব আর সঞ্জয়ের অভিভাবক ছিলেন যখন তারা বৃটেনে পড়াশুনা করবার জন্যে থাকতেন। ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পর লন্ডনের “স্পেক্টেটার” পত্রিকায় গান্ধী পরিবার সম্পর্কে তিনি বেদনাঘন স্মৃতিচারণ করেন। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ শুনবার পর একজন ভারতীয় সাংবাদিককে তিনি বলেন: “ইন্দু ছিল আমার একমাত্র বোন, যাকে আমি এখন হারিয়েছি। আমার জীবনে ইন্দু'র থেকে বিশ্বস্ত বন্ধু আর কেউ ছিল না।

“ইন্দুর মৃত্যু জোন অফ্ আর্কের মৃত্যুর সমতূল্য, যাঁর উত্থান হয়েছিল ফ্রান্সের অখন্ডতা রক্ষা এবং জাতীয় মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে। ইন্দুকে বার বার বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সে যা নয়, সেই ভাবে। তাঁকে যারা পছন্দ করে না, তারা সেটা করেছে। তাঁর ছিল ইস্পাতের মত কঠিন সাহস, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জোনের যে রকমটি ছিল। দেশের জন্যে, দেশের অখন্ডতার জন্যে তাঁর মৃত্যু বীরের মৃত্যু।”

ইন্দিরা গান্ধীর শেষকৃত্যে এক শত রাষ্ট্র ও সরকার-প্রধান এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় কী প্রচন্ড শ্রদ্ধা তিনি গোটা বিশ্বের সর্বরকম মতাদর্শের নেতাদের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রজন্মের কাছে ভারতকে তিনি প্রতীক করে তুলেছিলেন যেমনটি জওহর লাল নেহেরু করেছিলেন তাঁর সময়ে।

www.pathagar.com

বহু সাধারণ ভারতীয়দের চেহারায় আমরা ক্ষণস্থায়ী ভাবমূর্তি এবং গভীর প্রভাবের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দেখেছি।

ক্যামেরাম্যান-পরিচালক গোবিন্দ নিহালানি "গান্ধী" ছবির স্যুটিং-এর সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিষয়ে বলেন : "রোহিনী হাট্টানগেডি, তার স্বামী জয়দেব আর আমাকে রাতের খাবারের পর তার সাথে দেখা করবার জন্যে ডাকা হল। আমাকে তিনি সহজ এবং লৌকিকতা বর্জিত ভাবে গ্রহণ করলেন। তার ভেতর প্রবল শক্তি ছিল এবং আমি লক্ষ্যে করলাম তার ত্বক আভাময়। তার ছিল চমৎকার একটি হাসি এবং মজার কথায় তিনি আক্ষরিক অর্থে হাসিতে আরক্তিম হয়ে উঠছিলেন। পত্র পত্রিকা থেকে যে ইন্দিরা গান্ধীর ছবি আমি ধারণ করেছিলাম, তার থেকে একেবারে আলাদা একটা মানুষকে আমি সেদিন দেখেছি।"

তাজ গ্রুপের হোটেলগুলোর প্রধান পাচকদের ডাইরেক্টর সতিশ অরোরা স্মরণ করেন গোয়ায় কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে প্রতিনিধিদের জন্য খাবার টেবিল তিনি নিজে কী ভাবে দেখা শোনা করতেন। তিনি নিজে খাবারের তালিকা নির্দেশ করতেন, খেতেন সবার পরে, সব অতিথিদের খাওয়া শেষ হয়েছে সেটা দেখে তারপর। "তিনি বেশী খেতেন না।" তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, "কিন্তু সুন্দর ভাবে পরিবেশনা পছন্দ করতেন।"

এবং বোম্বাই-এর প্রিন্স অভ ওয়েলস যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক বি.ভি. সেট্টি. স্মৃতি চারণ করে বলেন : 'যখন তিনি কর্নাটকের বিজাপুর জেলার বাদামী-তে গিয়েছিলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ছালুকায়ান (Chalukyan) স্থাপত্যের ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন গুলো তিনি দেখতে চান কি না। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম এ কথা শুনে যে তিনি আগেই তা দেখেছেন এবং আরো হতবাক হয়ে গেলাম ক্যারল বোলন-এর সাথে ভারতীয় চিত্রকলা এবং স্থাপত্যের প্রায় অজানা দিকগুলো নিয়ে তার আলোচনা শুনে। ক্যারল বোলন ভারতীয় চিত্রকলার যশস্বী বিশেষজ্ঞ ড. স্টেলা ক্র্যামরিশ্চ-এর একজন ছাত্র, তিনি সে সময়ে বাদামী-তে ছিলেন।

একটি পূর্ণ এবং বিচিত্র জীবনের পরে শেষ পর্দা টেনে দেয়া হল। ইন্দিরা গান্ধীর সম্ভবত জীবনের অন্তিম অবস্থা নিয়ে একটা শঙ্কা ছিল। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে এই ছোট্ট চিরকুটটা ছিল : "আমি মৃত্যুকে একটুও কম অনুভব করি না এবং হৃদয়ের সেই প্রকান্ড নীরবতা ও প্রশান্তি আমাকে শেষ 'ইচ্ছাপত্র'-এর (Will) মতো কিছু লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

"যদি আমি সহিংসতায় মারা যাই, যেমনটি অনেকে ভয় পান এবং যেমনটি কয়েকজন ষড়যন্ত্র করছে, তা'হলে সে সহিংসতা হবে চিন্তার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

এবং গুপ্ত ঘাতকের কর্মে, আমার মৃত্যুর মধ্যে নয়। কারণ, কোন ঘৃণাই আমার জনগণ ও দেশের জন্য আমার ভালোবাসার ক্ষেত্রে ছায়া বিস্তারের জন্য গাঢ় নয়। কোন শক্তিই যথেষ্ট জোরাল নয় যে আমার অভিষ্ট লক্ষ্য এবং দেশকে সামনে এগিয়ে নেবার চেষ্টা থেকে আমকে সরিয়ে ফেলতে পারে।

"একজন কবি লিখেছেন 'প্রিয়তম/প্রিয়তমা, তোমার মত সম্পদ যখন আমার পাশে রয়েছে, তখন কীভাবে আমি নিজেকে অকিঞ্চিৎকর বলে বিবেচনা করবো।' ভারত সম্পর্কেও আমার একই কথা।

"আমি বুঝতে পারি না, কেমন করে একজন মানুষ ভারতীয় হয়ে গর্বিত না হয়ে পারেন। আমাদের আছে সমৃদ্ধ এবং অগুনতি ধারার উত্তরাধিকার, জনগণের আছে চমৎকার আত্মশক্তি, একই ভাবে যে কোন দুর্বিপাকে অথবা গুরু দায়িত্বে, বিশ্বাসে তারা অটল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণচঞ্চল, এমন কী দারিদ্র্যে এবং কষ্টেও।"

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইন্দিরা গান্ধীর অবদান এবং ইতিহাসে তাঁর আসন

ঔপন্যাসিক এবং তীক্ষ্ণ সমালোচক ভি.এস. নাইপল ভারতের অতীতের পূর্ণ দৃশ্যপট এবং তৃতীয় বিশ্বের সমসাময়িক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে জওহর লাল নেহেরু এবং ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা'র মূল্যায়ন করেন।

ইন্দিরা গান্ধী চলে যাবার পর তিনি লেখেন, "ভারত নেহেরু পরিবারের জন্য ধন্য। নেহেরু সাম্প্রতিক বিশ্ব-ইতিহাসে একজন অনন্য মানুষ ছিলেন। তিনি একজন ঔপনিবেশিক প্রথা-বিরোধী ব্যক্তিত্ব এবং একজন জাতীয় বীর, যিনি কখনো অন্ধ গোড়ামীর দ্বারস্থ হননি, যুক্তিবাদী এবং বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ।

"বিজ্ঞান, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং মানুষের আইন ও অধিকারের নীতি'র প্রতি নিবেদিত একজন মানুষ তিনি। ইন্দিরা গান্ধীর পথও এই একই ছিল.....নেহেরু পরিবারের অর্জন অবিশ্বাস্য : তাঁদের নেতৃত্বের কারণেই ভারতে শিল্প-বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তার সাথে সাথে এসেছে মেধা বিপ্লব।

"ভারতবাসীরা, যতটা স্বীকৃতি দিতে পারে তারও চেয়ে অনেক বেশী ঋণী দেশের স্থিতিশীলতার জন্যে, যা ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বাবাকে অনুসরণ করে অর্জন করেছিলেন। তিন অথবা চারটি প্রজন্ম হেসে-খেলে কাটাতে পারবে। এই ভারসাম্যতাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

"নেহেরুরা ভারতের সময়কে অগ্রগামী করেছেন। আমি ঠিক কী বলতে চাইছি, আপনি তা বুঝতে পারবেন যখন আপনি পাকিস্তানকে বিবেচনায় আনবেন। সেখানে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক বিপ্লব হয়নি; অথবা ইরান, সেখানে বড় জোর একটি শিক্ষিত প্রজন্ম রয়েছে.....সত্যিটা এই যে, এই সব বিশ্বাসের ভিত্তি জনতার অস্তিত্বের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে; এতেই প্রমাণ হয় ইন্দিরা গান্ধী জাতির জন্যে কাজ করেছেন। তাদের কখনো ভাসিয়ে দেয়া যাবে না, তাদের মাথা সমুন্নত থাকবে।"

www.pathagar.com

ভারতের আপাত-বিরোধিতা তার সাফল্যে, তার ব্যর্থতায়। তার ঐশ্বর্য্য এবং প্রায়ই হতবুদ্ধির আঞ্চলিকতার মিশ্রণ বিশাল একটা ক্যানভাসে জায়গা পেয়েছে। ইউরোপ একক অস্তিত্ব হিসেবে তার সব চেয়ে কাছের সমান্তরাল অবস্থাটির ধারণা দিতে পারে। কিন্তু ভারত এমন একটা জাতি, যা এখন পর্যন্ত বিপুল পরিমাণে ক্রমাগত পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে; তারা সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানে, প্রযুক্তিতে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে। যেহেতু সামাজিক পরিবর্তন সাধারণতঃ সরকারী নিয়ন্ত্রণে সামান্যই হয়, আচরণের এতিহ্যবাহী আদর্শ অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে নতুন ধরনের উৎপাদন, বন্টন এবং আদান-প্রদানের নানা রকম চাপে। এই উর্ধ্বগতি ব্যাহত হয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে বিপুল পরিমাণে জনগণের বাধ্যতামূলক অপসারন দ্বারা।

এই রকম একটা সমাজ ব্যবস্থায় পুরনো বর্বরতার টানা-হেচড়া সমাজের উপরি কাঠামো থেকে সামান্যই দূরে যেতে পারে। সে তার ভয়ংঙ্কর শক্তি সংগ্রহ করে সাম্প্রদায়িকতা থেকে; সেটা ধর্মের সত্যিকার আত্মশক্তি নয়। জোর দেয়া হয় ধর্মের বাইরের আচার-আচরনের বিশ্বাসের ভূতগ্রস্থতার ওপর। তবু আলোকিত ভারত তার কিছু মূল্যবোধে, ভেতরের কালো শক্তিকে দ্রুত চিহ্নিত করায় এবং ভূত তাড়ানোর দৃঢ় প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করায়। নিজের সন্দেহগুলো প্রকাশ করা এবং সংবাদপত্র, সিনেমা, সাহিত্য এবং সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং রাজনীতি সংক্রান্ত নানা ধরনের লেখার মাধ্যমে নিজস্ব প্রশ্নগুলো বর্হিবিশ্বে জানানোর বিষয়ে তার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে। ভারতীয় খবরেরকাগজগুলোতে ব্রিটেনসহ অন্যান্য দেশের তুলনায় বৈচিত্রপূর্ণ সব মতামত প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ইন্দিরা গান্ধীর অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির বিষয়ে সংবাদমাধ্যম অনেক বেশী জটিল ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিসেস থ্যাচারের ক্ষেত্রের চেয়ে।

অনেক দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে সময়ের আগেই চেতনার বিকাশ ঘটে। ভারতীয় সংসদীয় গঠনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে রচিত এবং আইনের নিয়ম কানুন অগ্রগামী শিল্পপতিদের ক্ষেত্রেও একই, যা একই সাথে স্বল্প শিক্ষা এবং নিস্তেজ অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপানকে গণতান্ত্রিক হবার জন্যে অনেকখানিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এমন কী বৃটেন, প্রচীনতম উদার গণতান্ত্রিক যে দেশ, সেখানেও ১৯২৮-এ মাত্র মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। সেখানে রাজনৈতিক কাঠামোর বিকাশ ঘটেছিল আধুনিক শিল্প-পণ্যের দ্রুত সম্প্রসারণের ভিত্তিতে। এই সাথে শিক্ষিত মানুষের হার বেড়েছিল এবং ধনী এবং দরিদ্রদের লক্ষণীয়ভাবে

www.pathagar.com

একই সাথে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছিল। সুতরাং আধুনিক ইতিহাসে এই ধরনের প্রতিষ্ঠিত ধারার বিপরীতে ভারতীয় গবেষণার ফল অভূতপূর্ব।

জরুরী অবস্থার বছরগুলো ছাড়া ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় গণতান্ত্রিক রীতিকে শ্রদ্ধা করেছেন। দিল্লীভিত্তিক দৈনিক 'ইন্ডিয়া টু-ডে' যেটার সাথে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রায়শই তীক্ষ্ণ মতপার্থক্য হত, তার সম্পাদক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এ ভাবে : "মিডিয়ার সাথে তাঁর হয়ত সমস্যা ছিল, কিন্তু তাঁর নিরন্তন বৈশিষ্ট্য ছিল এ রকম যে ১৯৮০-তে ক্ষমতায় ফিরে আসার পরও তাঁর অবস্থান এবং আচরণ-পদ্ধতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সংবাদমাধ্যম স্বাধীন ভাবে কাজ করবে এবং কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। তাঁর পুন-নির্বাচনের পর প্রায় পাঁচ বছর ধরেই তাঁর রাজ্যশাসন প্রণালী এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে 'ইন্ডিয়া টুডে'-তে অসংখ্যবার চূড়ান্ত সমালোচনামূলক লেখা ছাপা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবেও একটিবারের জন্যেও কোন রকম চাপ, বা দলগত নীতি মানতে বাধ্য করা অথবা কোন কিছু না ছাপতে বাধ্য করার মত কোন ঘটনা ঘটেনি।"

তৎসত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক রীতিতে কিছু অসুবিধা ছিল। ক্ষমতাকে অত্যাধিক কেন্দ্রীভূত করা, তাঁর আপাত অক্ষমতা অথবা ক্ষমতা বন্টনে অনিচ্ছা ছিল তাঁর দুর্বলতার প্রধান উৎস এবং তাঁর অনেকগুলো সমস্যার কারণ। তাঁর চারপাশের লোকজনের কাছ থেকে যে বিশ্বস্ততা তিনি প্রত্যাশা করতেন, সহজেই তা' অমাত্য এবং মোসাহেবদের কাছ থেকে পেতেন। এটা ভালভাবে বোঝা যায় যাদের তিনি বিশ্বাস করতেন, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনার মধ্য দিয়ে। ভারতীয় রাজনীতিতে ঐতিহাসিক ভাবেও বিশ্বস্ততা খুবই কম মূল্য পেয়েছে। সহস্র বছর ধরে তুর্কী, মুগল এবং বৃটিশ আগ্রাসনের ভেতর দিয়ে এসে জনগণ পরাজিতদের পক্ষে থেকে মাথা হারানোর ঝুকি নেবার চেয়ে বিজয়ী পক্ষ অবলম্বন করে সুবিধা নিতে শিখেছে।

এই রাজনৈতিক অবস্থানের সব চেয়ে বড় প্রভাব স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হল কংগ্রেসের ধীরে ধীরে পতনের মধ্য দিয়ে। সত্যিকারভাবে একটি সর্ব-ভারতীয় দল, যে দলটি স্বাধীনতার জন্যে নেতৃত্ব দিয়েছে, তার জনপ্রিয়তা নেমে গেলো গেয়ো উৎপীড়ন, মধ্যযুগীয় নেতা আর নগর এবং মহানগরের 'ট্যাম্যানি হল'-এর কর্তাদের জন্য।

ইন্দিরা গান্ধী আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের আহ্বান সন্দেহের চোখে দেখলেন। আবারও এই আচরণ সম্ভবতঃ ভারতীয় ইতিহাসের অতি-অনমনীয় অবস্থা হতে উৎসারিত। একজন যথেষ্ট অভিজ্ঞ বৃটিশ সাংবাদিক ট্রেভর ফিশলক, ভারতীয় উপমহাদেশ সম্মন্ধেও যিনি যথেষ্ট বিজ্ঞ, তিনি মনে

www.pathagar.com

করেন যে ভারত অজেয়। দেশটি যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে কেউ তাকে জয় করতে পারবে না। ইতিহাস থেকে বলা যায় যে, বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতকে পরাভূত করতে পেরেছে ভারতীয়দের সহযোগিতায়, সাধারণতঃ এক অঞ্চলকে অন্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে এবং একটু একটু করে গ্রাস করে। যাহোক, তৎকালীন বাস্তবতা নিজেই নিজের অবস্থা থেকে শিক্ষা নেয়। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলোর সম্পর্ক পরীক্ষা করে স্বচ্ছন্দে কাজ করবার উপায় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করার জন্য সরকারিয়া (Sarkaria) কমিশান নিয়োগ করে ইন্দিরা গান্ধী মনে করেছিলেন যে তাতে একটা পরিবর্তন ঘটতে পারে। সরকারী প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হল। তারা সংশোধন এবং নবায়ন দাবি করল।

ভারতের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নিশ্চিতভাবে তার বিশাল বিস্তার এবং অসহায় দারিদ্র্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক পরিমান তার করুণ শিকার। ইতিহাসের উত্তরাধিকার সূত্রে তা পাওয়া, ততটা ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে নয়। তবু এটা উল্লেখ করা দরকার যে তৎসত্ত্বেও তাঁর সময়ে জাতীয় আয় যখন ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখন দারিদ্র্য সীমার নীচে যারা বসবাস করে, তাদের অবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এই বঞ্চনার প্রেক্ষিত জাতীয় পর্য্যায়ে হতবুদ্ধিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল এবং সামাজিক নিষ্ঠুরতা বেড়ে যাচ্ছিল। ১৪০ বছর আগে ফ্রিডারিশ এ্যাঙ্গেল্‌স্ (Friedrich Engles) ব্রিটিশ শ্রমজীবিদের অবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা তুলনীয়।

অস্থির শ্রেণী-চরিত্রের একটি পরিবর্তনশীল সমাজে ব্যক্তিগত ভূমিকাও আকাশ-ছোঁয়া হতে পারে। জওহর লাল নেহেরু এবং ইন্দিরা গান্ধী সেই ভূমিকাটি পালন করেছেন এমন একটা সময়ে, যাকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা কাল। ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষেত্রে সেখানে আরও একটি মাত্রা যোগ করতে হবে যে তিনি ছিলেন নারী, যিনি পুরুষের বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরটি জয় করেছিলেন। তাঁর অবস্থান এবং অর্জন, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত নারীদের জন্য একটি পরম উদ্দীপনার বিষয়, যাদের শিক্ষা, দক্ষতা এবং ঝাপিয়ে পড়বার মানসিকতা আছে, যাদের চেতনা আছে প্রাচীন সংস্কারকে গুড়ো করে দেবার। তাজ হোটেল গ্রুপের অন্যতম পরিচালিকা ক্যামেলিয়া পাঞ্জাবীর মত, যিনি একজন অতিথি-সাংবাদিককে বলেছিলেন, "পুরুষদের সাথে লেনা-দেনায়, বিশেষ করে আমলাদের সাথে, যারা মহিলাদের নিরুৎসাহিত করেন, আমি তাদের বলি যে, 'তুমি প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এ কথা বলতে পারবে না,' এবং আমার এ কথা তাদের চুপ করিয়ে দেয়।"

www.pathagar.com

ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন জাতির চরম সঙ্কটের দিনে। ভারতের ভবিষ্যৎ তখন সার্বিক অর্থেই নিয়ন্ত্রণহীন। সেখানকার অনিশ্চিত রাজনীতি, হোচট-খাওয়া অর্থনীতি এবং বৈদেশিক হুমকির মুখে ভারতের ভীরুতা জাতির আত্মবিশ্বাসকে ক্ষয় করে ফেলেছিল। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে রাজনীতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনেন। পাঁক-কাদা ঠেলে বেরিয়ে আসে অর্থনীতি এবং তিনি বৈদেশিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন দৃঢ়তার সাথে। ভারত আজ বিশ্বের দশটি শিল্প-উন্নত দেশের অন্যতম এবং খাদ্যশস্যে দারুণ ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ ছাড়া বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে ভারত লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেছে। সেখানে প্রচুর নিরক্ষর জনগোষ্ঠি থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ দক্ষ জনশক্তি ভারতের। এই সব বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক মালিক পক্ষ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে লেনাদেনার ক্ষেত্রে ভারতকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এই জীবনসঞ্চারী বাস্তবতা আগামী দশকগুলোতে আরও স্পষ্ট ভাবে সুফল বয়ে আনবে।

কিন্তু মাথা পিছু আয় এবং মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব-নিকাশের প্রেক্ষিতে জীবনযাত্রার মান সমুন্নত রাখতে হলে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে অবশ্যই পরিবেশের উন্নয়নের কাজে নিরলস থাকতে হয়। মানুষ পরিবেশের সাথে সমন্বয় করে বেঁচে থাকে। এটা সেই দর্শন যা ইন্দিরা গান্ধী যথেষ্ট কর্তৃত্ব এবং মর্যাদার সাথে ভারতের বন্য-প্রাণীর জীবন সংরক্ষণে প্রয়োগ করেছেন। বাঘ সম্পর্কিত প্রকল্পের সাফল্য তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইন্দিরা গান্ধী জওহর লাল নেহেরুর পররাষ্ট্র নীতির কাঠামো গ্রহণ করেছিলেন এবং তার একটি নিয়ন্ত্রিত রূপ দান করেছিলেন। ১৯৭১-এ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সঙ্কটকে তিনি যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সেটা ছিল তাঁর কূটনীতিক দক্ষতার একটি পরম নিদর্শন। বিসমার্কের (Bismarck) অনন্য কীর্তির মত মহার্ঘ্য। জওহর লাল নেহেরু এবং ইন্দিরা গান্ধী প্রতিকূল চক্রের কাছে পরাস্ত না হয়ে ভারতকে ঝড়ো এবং অজানা সাগরে নোঙ্গর করাবার জন্যে প্রস্তুত করেছিলেন।

সেক্সপীয়ারের আলোয় আলোকিত হয়ে কেউ বলতেই পারেন :

> "পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ
> সব মানব এবং মানবী এখানে অভিনয় করছে
> তাদের প্রস্থান আছে, প্রবেশ আছে......"

ইন্দিরা গান্ধী বর্তমান সময় এবং অন্য প্রজন্মের ক্ষেত্রেও চার্লস দ্য গল্, হো চি মিন অথবা আবদেল গামাল নাসেরের মত অবিস্মরনীয় নেতা ছিলেন।

www.pathagar.com

দেশের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য, অনন্য। তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সাহসের উত্তরাধিকারকে পেছনে ফেলে গেছেন। সঙ্কটে সিদ্ধান্ত নেবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছেন তিনি; একাকী দুর্দান্ত পথিক। তাঁর বিশেষ মুহূর্তগুলো এসেছিল, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, ১৮ জানুয়ারী ১৯৭৭, ১২ মার্চ ১৯৭৭ এবং ৫ জুন ১৯৮৪ তারিখে।

তিনি জানতেন সেই চূড়ান্ত বিচারের সম্ভাব্য ফল কী হতে পারে। তাঁর ছিল গভীর বেদনা, যেমনটি তিনি এক সময় ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে বলেছেন—চিলিতে সালভাদর আলেন্দের সহিংস-মৃত্যু এবং তাঁর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করায় বিষয়টি তাঁকে কী গভীরভাবে আহত করেছিল। আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ শক্তিরা মিলেমিশে পরিকল্পনা করে শেষ করে ফেলেছিল আলেন্দেকে। কতখানি উৎকণ্ঠার ভেতর ইন্দিরা গান্ধী বাস করছেন কিউবান নেতা তাঁর চোখে তা' স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষায় তা আবৃত ছিল ইন্দিরা গান্ধীর "মর্যাদাপূর্ণ হিন্দু প্রথায়।"

ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৭-তে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় বলেছিলেন, উইন্সটন চার্চিলের মত নৈতিক গুণাবলীর ভেতর সাহসকে তিনি প্রথম স্থান দেবেন। বহু বছর আগে জওহর লাল নেহেরু ইন্দিরা গান্ধীকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "সাহসী হও, বাকিরা তোমায় অনুসরণ করবে। তুমি যদি সাহসী হও, তুমি কখনো এমন কিছু করবে না, যাতে তোমাকে লজ্জা পেতে হয়।"

এ উপদেশ ছিল ইন্দিরা গান্ধীর জীবনের ধ্রুবতারা। যার ভেতর দিয়ে তিনি বেঁচে থেকেছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন। এ কথাগুলো তাঁর সমাধিমন্দিরে লিখে রাখবার জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

টীকা ও ব্যাখ্যা

ফেবিয়ান ঃ সমাজতন্ত্রের মন্থর কিন্তু ক্রমবিস্তারের সমর্থক ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য।

স্টেইক ঃ জেনের মতাবলম্বী দার্শনিক স্টেইক।

লাডাইট ঃ ইংল্যান্ডের শ্রমিক সংঘ (১৮১১-১৬) তারা বেকারত্বের সম্ভাবনায় নতুন যন্ত্র ধ্বংস করতে উদ্যত হয়।

ক্যালভিনীয় ঃ ফরাসী প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মতাত্ত্বিক জঁ ক্যালভ্যানের (১৫২৯-১৫৬৪)'র মতবাদ।

ষ্টার চেম্বার ঃ ১৬৪১ খৃ: বিলুপ্ত ইংল্যান্ডের বিচার-সভা, যেখানে সাধারণতঃ রাজকীয় ব্যাপারের বিচার হত এবং তাড়াতাড়ি নিয়ম কানুন না দেখে বিচার শেষ হত।

তামমানি হল ঃ নিউইয়র্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থার অফিস ভবন। সচরাচর রাজনৈতিক দুর্নীতির ইঙ্গিতপূর্ণ।

১৯৭১ সালে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনের সামরিক আক্রমণ ঃ

"নিউ স্টেটম্যান" (ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৭৯) পত্রিকায় বৃটেনের বামপন্থীদের অগ্রগণ্য সমালোচক এ্যান্থনী বার্নেট লেখেন, "চীনা দাবির প্রেক্ষিতে প্রণীত মানচিত্রের দিকে কে দৃষ্টিপাত করতে পারে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার সম্প্রসারনবাদী শক্তি চীনের ভিয়েতনামে হামলার বিষয়ে? বাহ্যতঃ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন তা পারে। 'এশিয়ান কিউবা' ভিয়েতনামের ওপর আক্ষরিক অর্থে আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল ব্রেজজিনিস্কি'র মৌণ সম্মতিতে। "ওয়াশিংটন পোষ্ট"-এর খবর অনুযায়ী এই অবৈধ আক্রমণের সূচনা হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডেং-এর স্বদেশে ফেরার পর। তিনি বার বার করে নিশ্চিত করেছিলেন : যে শাস্তিই তিনি ভিয়েতনামকে দিন না কেন, তাতে এই নতুন (চীন-আমেরিকা) মিত্রতার কোন ক্ষতি হবে না। চীন কম্বোডিয়া বা ভিয়েতনামীদের ভীতি-প্রদর্শনমূলক কথাবার্তায় কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। কিন্তু ১৯৭৫-এ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের বিজয়ের প্রেক্ষিতে চীন ভিয়েতনামকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল।

কাগজটি'র আবাসিক ইউএস সংবাদদাতা ক্লডিয়া রাইট ওয়াশিংটন থেকে রিপোর্ট করেন : "কম্বোডিয়ার আক্রমণকারীকে শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়ে চীন একমাত্র শক্তি নয়। চীনা বাহিনীকে আক্রমণে পাঠাবার আগে ডেং ঝিয়াওপিং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে শক্তির আস্ফালনমূলক মনোহারী কথাবার্তা বলে কার্টার প্রশাসনকে এমন ভাবে মুগ্ধ করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামকে সর্বসান্ত করার জন্যে দ্রুত একটি কার্যকর পরিকল্পনা করে ফেলে।

"যে বিষয়টি সংবাদপত্র স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা হল ভিয়েতনামীরা তাদের কেবল খেমার রুজ এলাকাতেই হারিয়ে দেয়নি। সেটি করতে কমপক্ষে ১০,০০০ শক্তিশালী চীনা উপদেষ্টাদের বিশাল বাহিনীকে ছিঁড়ে-খুড়ে যেতে হয়েছিল। ত্রিশ বছরেরও বেশী সময়ের ভেতর বিদেশী শত্রুদের হাতে

www.pathagar.com

এ রকম সামরিক মার খাবার অভিজ্ঞতা চীনাদের ছিল না। আমেরিকার প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়ঙ্কর ক্রোধের।"

আমেরিকা তাদের সব মিত্রদের চাপ দিয়েছিল হ্যানয়কে সব রকম সাহায্য বন্ধ করার জন্যে। ক্লডিয়া রাইট লেখেন : এই ঝঙ্কৃত নিষেধাজ্ঞা ১৯৭০-এ চিলিতে বিনিয়োগ বন্ধের ইঙ্গিতবাহী।

এই বৈরীতার বিরতির বিষয়ে আরও একটি বিশ্লেষণে বার্ণেট (এপ্রিল, ৬) দেখান যে, চীনাদের অভিযান কেমন করে সামরিক এবং কূটনৈতিকভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছে। সোভিয়েতের চরম হুমখীর মুখে মার্চ ১, ১৯৭৯-তে পিকিং তার বাহিনী ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। কার্টার এবং তাঁর উপদেষ্টারা স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে শাস্তি দেবার যে পরিকল্পনা তারা করেছিলেন, তা হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। চীন সরে আসতে বাধ্য হয়। সুতরাং "শাস্তি দেবার জন্যে নৈতিক এবং সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের যে ধারনা দেয়া হয়েছিল, বাস্তবতা তা থেকে অনেক দূরে। হ্যানয় এবং ওয়াশিংটন, দু' জায়গাতেই পিকিং-এর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়ে।"

www.pathagar.com

সহায়ক পত্র-পত্রিকা ঃ

Newspapers :

Indian

The Statesman
Hindustan Times
The Times of India
Patriot
The Tribune
The Hindu
Deccan Herald
The Telegraph

British

The Times
The Guardian
Financial Times
The Daily Mail
The Daily Express
The Observer
The Sunday Times

American

International Herald Tribune
(Published from Paris)

Journals and Magazines

Indian

India Today
Sunday
Blitz

British

The Economist
Spectator
New Statesman

American

Time
Newsweek

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী :

Books :

Krishan Bhatia, *Indira : A Biography of Prime Minister Gandhi,* London, 1974.

Michael Brecher, *Nehru : A Political Biography,* London, 1959, (The passage on Motilal Behru's Lifestyle in Chapter 1 is cited here)

Pran Chopra, *India's Second Liberation,* Delhi, 1973 (The quotation from the US Senate Committee Report on India in chapter 3 is cited in this book)

Trevor Fishlock, *India File,* London, 1983

Indira Gandhi, *Speeches,* London, 1975

Sarvepalli Gopal, *Jawaharlal Nehru : A Biography,* Volume 2, London, 1979

(For Nehru on Jayaprakash Narayan)

Sarvepalli Gopal, *Jawaharlal Nehru : A Biography,* Volume 3, London, 1984

Y. D. Gundevia, *Outside the Archives,* Delhi, 1984 (Full of interesting information on the Anglo-American diplomatic pressure brought to bear on Nehru over Kashmir immediately after the Sino-Indian border conflict)

Sisir Gupta, *Kashmir in India-Pakistan Relations,* Delhi, 1967 (The quotation on the destruction of a church in Kashmir by Masood tribesmen was cited in this book)

Seymour Hersh, *The Price of Power,* New york, 1983

T.N. Kaul, *The Kissinger Years,* Delhi, 1981

Henry Kissinger, *The White House Years,* London, 1979

D.R. Mankekar, *Pakistan Cut to Size,* Delhi, 1972

Anthony Mascarenhas, *The Rape of Bangladesh,* Delhi, 1971

Dom Moraes, *Mrs. Gandhi,* London, 1980

Kuldip Nayar, *The Judgment : Inside Story of the Emergency,* Delhi, 1977

Jawaharlal Nehru, *Glimpses of World History,* Delhi, 1982

Jawaharlal Nehru, *A Bunch of Old Letters,* Delhi, 1958

Escott Reid, *Envoy to Nehru,* London, 1977

Bhabani Sen Gupta, *The Afghan Syndrome,* London, 1982

Salmaan Taseer, *Bhutto : A Political Biography,* London, 1979

Janardhan Thakur, *All the Prime Minister's Men,* Delhi, 1977

Nayantara Sahgal, *Indira Gandhi : Her Road to Power,* 1982

Lt.Gen. J.F.R. Jacob, *Surrender at Dacca :Birth of a Nation*, Manohar Publishers, Delhi, 1977.

www.pathagar.com

নামপঞ্জী

অটল বিহারী বাজপাই ৬০, ৬৫
অতুল্য ঘোষ ২৬
আইউব খান, জে. ২৫, ৩৫, ৫০
আওরঙ্গজেব ৭৭
আবদেল গামাল নাসের ৭৩, ৯০
আয়াতউল্লাহ খোমেনি ৭৯
আই. এফ. স্টোন ৪১
ইন্দিরা গান্ধী ৯, ১১, ১৩, ১৬-৯, ২১-৩, ২৬-৮, ৩০-৪, ৪১-৩, ৪৫, ৪৭-৫৩, ৫৮, ৬০-৬২, ৬৪, ৬৮-৭৩, ৭৫, ৭৯-৮১, ৮৩-৪, ৮৬, ৮৮-৯১
ইদি আমিন ৫৩
ইয়াহিয়া খান, জে. ৩৫-৬, ৪০, ৪২, ৪৭, ৭৫
এল. কে. ঝা ৪০
এন্ড্রোপভ ৬৮
এ্যান্থনি মাসকারেনহাস ৩৬
এ্যাঙ্গেলস, ফ্রিডারিশ ৮৯
ওলাফ ক্যারো, স্যার ৭২
ওয়েবস ১৮
ওয়াভেল, লর্ড ৭২
কামরাজ নাদার ২৬-৭
কোকা সুধা রাও ৩০
কিসিঞ্জার, হেনরী ৪০-১, ৪৪, ৬৮
কৈরালা, বি.পি. ৪৬
ক্যারল বোলন ৮৪
ক্যামেলিয়া পাঞ্জাবী ৮৯
গঙ্গা সিং ধীলন ৭৮
গান্ধী, মহাত্মা ১৫, ১৮, ২১, ৫৪, ৫৭
গান্ধী, ফিরোজ ১৯, ২৩
গিরি, ভি.ভি ৩১-৩
গুলজারী লাল নন্দ ২৬-৮
গোখলে ১৫
গোবিন্দ নিহালানি ৮৩
চার্চিল, উইন্সটন ৯১
চরণ সিং ৫৯, ৬২
চারু মজুমদার ৪৭
চ্যাবন, যশবন্ত রাও ৬০
চার্লস দ্য গল ৯০
চৌ এন লাই ৪১, ৪৪
জগজীবন রাম ৫৮-৯, ৬২
জর্জ ফার্নান্দেজ ৪৯, ৬২
জয়প্রকাশ নারায়ন ৪০, ৪৫-৬, ৪৮-৫০, ৫২, ৫৪-৫, ৫৮-৯
জার্নাইল সিং ৭৯
জশপাল কাপুর ৫১
জয়বর্দ্ধন, প্রেসিডেন্ট ৭১
জাকির হোসেন, ড. ৩০-১
জিয়াউল হক, জে. ৬৬, ৭০-১
জে. এল. সিনহা ৫১-২
জোন অব আর্ক ১৩, ৮৩
জোসিপ ব্রজ টিটো ৭২
টিক্কা খান, কে. ৩৬
ট্রেভর ফিশলক ৮৮
ডম্ মোরাজ ৫৫
ডব্রেনিন, রাষ্ট্রদূত ৬৮
ডরোথি নরম্যান ৮২-৩
ডেং জিয়াপিং ৬৫
তিলক, বি.জি. ৫৭
দরবারা সিং ৭৮
দাদাভাই নওরোজী ৫৭
দাস, সি. আর. ৫৭
দেবরাজ উরস্ ৬২-৩
দেশাই, মোরারজী ২৬-৭, ২৯, ৩০-২, ৫০, ৫৫, ৫৯-৩, ৬৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 984-70148-0015-5
9 789847 840116 >